বাংলা সাহিত্য

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

নবম ও দশম শ্রেণির **বাংলা সাহিত্য** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর আলোকে প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাক্রম সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদিকে এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়ও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[**লেখক-পরিচিতি:** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি প্রথমে সংস্কৃত ও পরে ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। একাধারে পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও খ্যাতনামা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তিনি। সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস, যথাযথভাবে যতিচিহ্ন প্রয়োগ এবং সাহিত্যিক গদ্য রচনার জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে। বাংলা বর্ণমালাকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন শিশুপাঠ্য বই *বর্ণপরিচয়*। ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ বই আজও পথপ্রদর্শক বিবেচিত হয়। *বেতাল পঞ্চবিংশতি, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ* প্রচলিত হওয়া উচিত কি না *এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস* প্রভৃতি তাঁর প্রধান গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।]

আলী ইবনে আব্বাস নামে এক ব্যক্তি মামুন নামক খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে খলিফার নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলিফা আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কল্য আমার নিকট উপস্থিত করিবে। তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ যদি তিনি পলাইয়া যান, আমাকে খলিফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কাস আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কাস নগরের, বিশেষত যে অংশে আপনার বাস তাহার উপর, জগদীশ্বরের শুভদৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি একসময় আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম : বহু বৎসর পূর্বে ডেমাস্কাসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলাম এবং গৃহস্বামীর নিকট গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাসকাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী স্থাপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয়, আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতি স্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ জন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখ প্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনো কোনো উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনো অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাসকাল আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম এবং কী দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলিফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্তে নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচ প্রকৃতির লোক ঈর্ষাবশত শত্রুতা করিয়া খলিফার নিকট আমার ওপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; বোধ করি আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন; এই বলিয়া পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এ জন্য আমার ওপর খলিফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না। আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনও হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার ওপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে। যদি আপনার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও আমার কোনো ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি খলিফার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া খলিফা উদ্ধত বচনে বলিলেন, কী বলিতে চাও, বল। তখন সে ব্যক্তি ডেমাস্কাস নগরে কীরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এ জন্য তাহাতে কোনোমতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ে সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্‌বিবেচক তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসুক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশত অমূলক দোষারোপ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনো দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এ ক্ষেত্রে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

খলিফা মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর প্রসন্ন বদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাহাকে অবিলম্বে এই সংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া আহ্লাদের সাগরে মগ্ন হইয়া আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহাকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলিফা অবলোকনমাত্র, প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলিফা, তাহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন এবং ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : **প্রত্যুপকার-** উপকারীর উপকার করা। **অভিরুচি-** ইচ্ছা। **সমভিব্যাহারে-** সঙ্গে বা সাহচর্যে। **নিষ্কৃতি-** মুক্তি। **কোপানল-** কোপ ও অনল মিলে কোপানল; ক্রোধ বা রাগের আগুন। এখানে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। **প্রতীতি-** বিশ্বাস; ধারণা। **পরিচ্ছদ-** পোশাক। **প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে-** শব্দটিতে মূলত তিনটি শব্দ যুক্ত করা হয়েছে; প্রীতি, প্রফুল্ল ও লোচন—বন্ধুত্বের অনুভূতিতে আনন্দিত চোখে। লোচন অর্থ চোখ। **মৌনাবলম্বন-** মৌন ও অবলম্বন মিলে মৌনাবলম্বন; অর্থাৎ নিরবতা পালন। **অব্যাহতি-** মুক্তি, ছাড়া পাওয়া। **অবধারিত-** নিশ্চিত। **প্রত্যাগমন-** ফিরে আসা। শব্দটি গঠিত দুটি শব্দ মিলে: প্রতি ও আগমন। **রোষারক্ত নয়নে-** ক্রোধে লাল চোখে। **অবলোকনমাত্র-** দেখামাত্র। **সম্ভাষণ-** সম্বোধন। **উৎকট-** অত্যন্ত প্রবল, তীব্র। **অবরুদ্ধ-** বন্দি। **নিরীক্ষণ-** মনোযোগ দিয়ে দেখা। **খলিফা-** প্রতিনিধি। হজরত মুহম্মদ (স.)-এর পরে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসনকর্তাকে 'খলিফা' বলা হতো। তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান শাসক ও ধর্মনেতা ছিলেন।

ডেমাস্কাস- দামেস্ক। এশিয়ার একটি প্রাচীন শহর। হজরত ইব্রাহিমের (আ.) যুগের পূর্বে এখানে শহর গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে দামেস্ক সিরিয়ার রাজধানী।

মামুন- আল মামুন নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা এবং খলিফা হারুনর রশীদের দ্বিতীয় পুত্র।

বাগদাদ- বর্তমান ইরাকের রাজধানী। খলিফা হারুনর রশীদের সময় বাগদাদ মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। টাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে এবং ফুরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ-পরিচিতি : 'প্রত্যুপকার' রচনাটি *আখ্যানমঞ্জরী* দ্বিতীয় ভাগ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী* রচিত হয় ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। বিশ্বের নানা দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবদীপ্ত ঘটনাই এ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার উপজীব্য। 'প্রত্যুপকার' আলী আব্বাস নামক এক ব্যক্তির প্রতি-উপকারের কাহিনি। খলিফা মামুনের সময়ে দামেস্কের জনৈক শাসনকর্তা পদচ্যুত হন। নতুন শাসনকর্তা মামুনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন আলী ইবনে আব্বাস। তিনি স্থানীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে আশ্রয়লাভ করে জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতা ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি খলিফা মামুনের সৈন্যদল কর্তৃক বন্দি হন এবং খলিফার নির্দেশে আলী ইবনে আব্বাসের গৃহে তাকে অন্তরীণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আলী ইবনে আব্বাস বন্দি ব্যক্তির সঠিক পরিচয় জানতে পেরে উপকারীর উপকারের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং খলিফার কাছে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। বস্তুত এ রচনায় দুজন মহৎ ব্যক্তির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তাদের একজন নিঃস্বার্থ উপকারী, অন্যজন সকৃতজ্ঞ প্রত্যুপকারী। খলিফার মহত্ত্বও এ রচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. কোনো ব্যক্তি তাঁর উপকারীর উপকার করেছেন এমন কোনো ঘটনা তোমার জানা থাকলে তা লিখ।

২. উপকারীর উপকার না করে অপকার করেছে; এরকম একটি ঘটনার বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। খলিফা মামুন কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?

ক. বাগদাদ খ. ডেমাস্কাস
গ. সিরিয়া ঘ. ইরান

উদ্দীপকটি পড়ে ২-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সে বিস্ময়াবহ কাহিনি শুনিয়া নৃপতি মুগ্ধ হইলেন। বহুদিনের বিদ্বেষভাব দূরে গেল, ভক্তিতে অন্তর আর্দ্র হইল। প্রেমের জয় হইল। নৃপতির কণ্ঠে হাতেমের জয়গান। তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া উত্থিত হইল— ধন্য হাতেম, ধন্য তাহার কুল!

২। নৃপতির মাধ্যমে 'প্রত্যুপকার' গল্পের খলিফার কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বদান্যতা খ. মহানুভবতা
গ. দানশীলতা ঘ. ঔচিত্যবোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন

চুরির অভিযোগে কিছুলোক জনৈক ব্যক্তিকে চেয়ারম্যানের ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করল। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি চৌকিদার আমজাদকে ডেকে নির্দেশ দিলেন বন্দিকে তার বাড়িতে রাখতে। ঘটনাক্রমে আমজাদ জানতে পারলেন, বন্দি ব্যক্তি আর কেউ নয়, সে দশ বছর আগে আমজাদের সন্তানকে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছিল, নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে আহত সন্তানের সেবা করেছিল। কিন্তু আমজাদ নিজের ক্ষতি হবে ভেবে না চেনার ভান করে চুপ করে রইল।

ক. 'প্রত্যুপকার' শব্দের অর্থ কী?
খ. খলিফা মামুন কিছুক্ষণ মৌন হয়ে ছিলেন কেন?
গ. উদ্দীপকের বন্দির ঘটনা প্রত্যুপকার গল্পের কোন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'আমজাদ ও আলী ইবনে আব্বাস উভয়ই বন্দি কর্তৃক উপকৃত হলেও এরা একরকম নয়'— বিশ্লেষণ কর।

ফুলের বিবাহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি:** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬শে জুন ১৮৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সে বছরই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ হিসেবে। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বাংলা কথাসাহিত্যে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হলো: *কপালকুন্ডলা*, *মৃণালিনী*, *বিষবৃক্ষ*, *ইন্দিরা*, *যুগলাঙ্গুরীয়*, *রাধারানী*, *চন্দ্রশেখর*, *রজনী*, *কৃষ্ণকান্তের উইল*, *রাজসিংহ*, *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরানী* ও *সীতারাম*। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *কমলাকান্তের দপ্তর*, *লোকরহস্য*, *কৃষ্ণচরিত্র* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।]

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল–শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড়োলোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড়ো উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড়ো রাগী, কন্যার্কতা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভালো, কিন্তু বড়ো দেমাগ, প্রায় তাঁহার বর পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ মেয়ে আছে?'

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, 'আছে!' ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব।'

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, 'গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।'

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, 'আমার মেয়েগুলি বড়ো লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।'

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল— বলিল, 'দিদি, একবার ঘোমটা খোল— নইলে, বর আসিবে না— লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোনা আমার, ইত্যাদি।' কলিকা কতবার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কতবার বলিল, 'ঠান্‌দিদি, তুই যা!' কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালিতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ গুণাগুণ্! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?'

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, 'ফর্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিবে।' ভ্রমর বলিলেন, 'গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ— ঘটকালিটা?'

কন্যাকর্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, 'তাও হবে।'

ভ্রমর— 'বলি ঘটকালির কিছু আগাম দিলে হয় না?' নগদ দান বড়ো গুণ—গুণ্ গুণ্ গুণ্।'

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, 'আগে বরের কথা বল— বর কে?'

ভ্রমর— 'বর অতি সুপাত্র।— তাঁর অনেক গুণ-ণ্‌– ণ্‌।'

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাপ বংশ বড়ো কুলীন; কেন না, ইহারা 'ফুলে' মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাপের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালির সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়িতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, 'আজি কালি ফুটিবে।'

গোধূলিলগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্রী চলিল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী— শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মতো বড়ো উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি

নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল — উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড়ো বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিঁপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়ো– কোন বিবাহে না এরূপ বরযাত্রী জোটে, আর কোন বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্রী আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড়ো বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ–হুম করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্রী, সকলে অবাক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্রী সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে –রূপের ভারে সকলে ভাঙিয়া পড়িতেছে। যুথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সুতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর–ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘিরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যুঁই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কতো তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এককোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড়ো মানুষের গৃহিণীর মতো মোটা নীল শাড়ি ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন–

'কমলকাকা–ওঠ বাড়ি যাই– রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়বে যে?' কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল; – চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? – মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে– এই আছে এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,– সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে– স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে – ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে।

কুসুম বলিল, 'ওঠ না– কি কচ্চো?'

আমি বলিলাম, 'দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।'

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কার বিয়ে, কাকা?' আমি বলিলাম, 'ফুলের বিয়ে।'

'ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।'

'কই?'

'এই যে মালা গেঁথেছি।' দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : কন্যাভারগ্রস্ত – বিবাহযোগ্যা কন্যা বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বহনকারী অর্থে। **সম্বন্ধের** – বিয়ের। **কন্যাকর্তা** – কন্যার অভিভাবক। **পত্রাসন** – পাতার ওপর আসন। **অবগুণ্ঠনবতী** – ঘোমটা দেওয়া নারী। **ইয়ারকি** – রসিকতা; ফাজলামি **সন্ধ্যাঠাকুরাণী দিদি** – এখানে সন্ধ্যাকালকে দিদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। **পরিমল** – সুগন্ধ। **গন্ধোপাধ্যায়** – গন্ধের রাজা বোঝাতে। **কুলাচার্য** – কুলের আচার্য বা বংশের প্রধান পুরোহিত। **বাঞ্ছামালি** – যে মালি ইচ্ছামতো ফুল ফোটাতে পারে। **খদ্যোত** – জোনাকি পোকা। **এয়োগণ** – সধবা নারীরা। **কমলকাকা** – কমলাকান্তকে কাকা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

পাঠ পরিচিতি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লঘুরচনা *কমলাকান্তের দপ্তর* গ্রন্থের নবম সংখ্যক লেখা 'ফুলের বিবাহ'। এই রচনায় হাস্যরসের মাধ্যমে বিভিন্ন ফুলের নাম, সে ফুলগুলোর গন্ধের তারতম্য, বর্ণের রকমফের অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কখন কোন ফুল ফোটে সে পর্যবেক্ষণও এই রচনায় পাওয়া যায়। বিয়ে-অনুষ্ঠান বাড়ির শিশু-কিশোর ও প্রতিবেশীদের মধ্যে অতীব আনন্দ নিয়ে আসে। এই অনুষ্ঠানে বর-কনে কেন্দ্রে থাকলেও বর-কনের মাতা-পিতা, কনের পড়শি নারীরা নানাভাবে সম্পৃক্ত থাকেন, ঘটকও থাকেন বিশেষভাবে যুক্ত। বিয়ে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এমন নানা ব্যক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন ফুলের উল্লেখ করে অসাধারণ দক্ষতায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির গার্হস্থ্য একটি অনুষ্ঠানকে আরও আনন্দদায়ক করে এখানে উপস্থাপন করেছেন। এখানে লেখক প্রকৃতিকে বাস্তব জীবনে উপস্থাপনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ফুলের বিবাহ' গদ্যটি কৌতূহলী ও পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সহায়ক।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. পাঠটিতে যেসব ফুলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর নাম ও গন্ধের পরিচয় দিয়ে একটি ছক তৈরি কর।

২. ফুলের বহুবিধ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'ফুলের বিবাহ' গল্পের পাত্র কে ছিল?

ক. মল্লিকা খ. স্থলপদ্ম

গ. রজনীগন্ধা ঘ. মালতী

২। এ গল্পে কন্যাকুল বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

ক. ভোমর খ. বৃক্ষ
গ. গাছপালা ঘ. ফুল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

জমিদার জনার্দন ঘোষ মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রায়বাহাদুর শুভাশিস চৌধুরীর একমাত্র পুত্র দেবাশিসকে পাওয়া গেল। রূপে -গুণে সে অতুলনীয়।

৩। উদ্দীপকের দেবাশিসের সাথে 'ফুলের বিবাহ' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে –

i. গন্ধরাজের
ii. গোলাবের
iii. রজনীগন্ধার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মৌরি একদিন বাবার কাছে বায়না ধরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাবে। বাবা একদিন ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলে সে ভীষণ খুশি হয়। নানা জাতের ফুল-ফলের গাছের সমারোহ দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন সে যেসব ফুল-ফলের নাম শুনেছে সেগুলো আজ নিজ চোখে দেখে খুবই আনন্দিত হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়– বাড়ির আঙিনায় ছোট্ট একটা বাগান করবে।

ক. 'ফুলের বিবাহ' গল্পে কে ঘটকের দায়িত্ব পালন করে?

খ. ক্ষুদ্র বৃক্ষটি কেন বিরক্ত হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের মৌরির ভালোলাগার বিষয়ের সঙ্গে 'ফুলের বিবাহ' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মৌরির মাঝে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াই যেন 'ফুলের বিবাহ' গল্পের মূল চেতনা।" – যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**লেখক-পরিচিতি :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর *বনফুল* কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি *Gitanjali: Song Offerings* সংকলনের জন্য এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বস্তুত তাঁর একক সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে *মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *কল্পনা*, *ক্ষণিকা*, *বলাকা*, *পুনশ্চ*, *চোখের বালি*, *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা*, *বিসর্জন*, *ডাকঘর*, *রক্তকরবী*, *গল্পগুচ্ছ*, *বিচিত্র প্রবন্ধ* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন; কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন– কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন। সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল–এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যেভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো: সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতার অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না– মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর– অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো, বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনই অবসর পায় তখনই সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর– সমস্ত মিশিয়ে চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা – বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যেভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত– একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত– তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত– তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরও একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি– তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়– কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরের যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ– ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেক সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ– এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের জন্য একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত— মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে— কে বসিয়া?— আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু— আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে পূর্ণিমাপ্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন— কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।
অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতায় চলো।"

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত– ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী– একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল– দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়তে লাগিল।

সেদিন শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল– যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।' ❑ [সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা : গর্ভের কলঙ্ক – সন্তান হিসেবে কলঙ্ক। গর্ভ হলো মায়ের পেট। যে ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিবারে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয় তা হলো কলঙ্ক। **সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট** – বড়ো পাতাবিশিষ্ট। এখানে চোখের পাতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **ওষ্ঠাধর** – ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের ও নিচের ঠোঁট [ওষ্ঠ+অধর = ওষ্ঠাধর]। **কিশলয়** – গাছের নতুন পাতা। **তর্জমা** – অনুবাদ, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর। **অস্তমান** – ডুবন্ত, ডুবে যাচ্ছে এমন, চন্দ্র-সূর্যের পশ্চিম দিকে অদৃশ্য অবস্থা। **অনিমেষ** – অপলক, পলকহীন। **উদয়াস্ত** – উদয় + অস্ত = উদয়াস্ত, আবির্ভাব ও তিরোভাব, ওঠা ও ডুবে যাওয়া। **ছায়ালোক** – ছায়া + আলোক = ছায়ালোক। কোনো বস্তুর ওপর আলো পড়লে বিপরীত দিকে যে প্রতিবিম্ব হয় তা হলো ছায়া। **বিজন মহত্ত্ব** – বিজন – জনশূন্য, নির্জন; **মহত্ত্ব** – মহৎগুণ; বিজন মহত্ত্ব – কোলাহলমুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণীয় দিক। **তন্বী** – ক্ষীণ ও সুগঠিত অঙ্গবিশিষ্ট। **বাঁখারি** – কাঁধের দুদিকে দুপ্রান্তে ঝুলিয়ে বোঝা বহনের বাঁশের ফালি। **ঢেঁকিশালা** – যে ঘরে ঢেঁকি রাখা হয়। ঢেঁকি হলো ধান থেকে চাল তৈরির লোকজ যন্ত্র। এখনো গ্রামীণ জীবনে অনেক বাড়িতে ঢেঁকির ঘর আছে। **গার্হস্থ্য সচ্ছলতা** – পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের সচ্ছলতা। **চিরনিস্তব্ধ হৃদয়**

উপকূল – শান্ত হৃদয়। **ঝিল্লিরব পূর্ণ** – ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ/শব্দে মুখর। **বিজনমূর্তি** – নির্জন অবস্থা। বিজন হলো নির্জন বা জনমানবশূন্য, মূর্তি হলো কোনোকিছুর প্রতিকৃতি। বিজনমূর্তি শব্দটি এখানে কোলাহলহীন অবস্থা বা নির্জন/জনমানবশূন্য অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। **গণ্ডদেশ** – গাল। **মূক** – বধির, বোবা। **বিষাদশান্ত** – দুঃখমগ্ন, বিষাদ = স্ফূর্তিশূন্যতা, বিষণ্ণতা। বিষাদশান্ত হলো খুব বেশি বিষাদগ্রস্ততা থেকে যে শান্ত অবস্থা। **পূর্ণিমাতিথি** – চাঁদের পরিপূর্ণ রূপ হওয়ার সময়। **কন্যাভারগ্রস্ত পিতা-মাতা** – যে পিতা-মাতার বিবাহযোগ্যা কন্যা সন্তানের বিয়ে হয়নি। **কপোল** – গাল। **নেত্রপল্লব** – চোখের পাতা। **শুক্লাদ্বাদশী** – চাঁদের বারোতম দিন।

পাঠ-পরিচিতি : 'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত *গল্পগুচ্ছ* থেকে সংকলিত হয়েছে। বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধে গল্পটি অমর হয়ে আছে। সুভা কথা বলতে পারে না। মা মনে করেন, এ-তার নিয়তির দোষ, কিন্তু বাবা তাকে ভালোবাসেন। আর কেউ তার সঙ্গে মেশে না, খেলে না। কিন্তু তার বিশাল একটি আশ্রয়ের জগৎ আছে। যারা কথা বলতে পারে না সেই পোষা প্রাণীদের কাছে সে মুখর। তাদের সে খুবই কাছের জন। আর বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির সনদ। 'সুভা গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মন ও চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতর দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন। শিশুর এ ধরনের প্রতি সকলের মমত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তুতে সহায়তা করে এ গল্প।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়? এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

২. তোমার চারপাশের সমাজে সুভার মতো কারো জীবন-বাস্তবতা থাকলে তা নিজের ভাষায় লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ছিপ ফেলে মাছ ধরা কার প্রধান শখ ছিল?

ক. সুভাষিণীর খ. বাণীকণ্ঠের

গ. সুকেশিনীর ঘ. প্রতাপের

২। বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল কেন?

i. সুভাকে বিয়ে দেবেন বলে
ii. সুভা কথা বলতে পারে না বলে
iii. মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

সেই ছোট্টবেলায় মর্জিনা একটি বিড়াল ও একটি কুকুর ছানা এনেছিল। নাম দিয়েছে পুষি আর পুটু। আজ পুষি আর পুটু পুরোপুরি বড়ো হয়েছে। নাম ধরে ডাকলে মুহূর্তেই হাজির হয়। পুষি কোলে উঠে বসে কিন্তু পুটু একটু দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ায়

৩। মর্জিনার মধ্যে সুভার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হলো—

ক. ইতর প্রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ
খ. ইতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
গ. একাকিত্বের সাথি ইতর প্রাণী
ঘ. সবার থেকে নিজেকে আড়ালে রাখা।

৪। উদ্দীপকের মূলভাব 'সুভা' গল্পের কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে?

i. দিনে তিনবার গোয়ালঘরে যাওয়া
ii. দুই বাহু দ্বারা গলা জড়িয়ে ধরা
iii. মাঝে মাঝে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

দুই পুত্রসন্তানের পর কন্যাসন্তান পলাশ বাবুর পরিবারে আনন্দের বন্যা নিয়ে এল। নাম রাখা হলো 'কল্যাণী'। সকলের চোখের মণি কল্যাণী বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পলাশ বাবু বুঝতে পারলেন, বয়সের তুলনায় কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঘটেনি। কিছু বললে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। কল্যাণীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পলাশবাবু কল্যাণীর অবস্থা বরপক্ষকে খুলে বললেন। সব শুনে বরের বাবা সুবোধ বাবু বললেন, 'পলাশ বাবু কল্যাণীর মতো আমার ছেলেও তো হতে পারত, কাজেই কল্যাণীমাকে ঘরে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

ক. সুভার গ্রামের নাম কী?
খ. 'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার' — কথাটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার যে বিশেষ দিকটির সঙ্গতি দেখানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন' — বিশ্লেষণ কর।

লাইব্রেরি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দি করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে- দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জাগয়ার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে 'দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।' এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে– কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ-বিদেশ হইতে অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে। বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব।

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : কল্লোল- ঢেউ। **শঙ্খ**- শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। **উল্লঙ্ঘন**- পার হওয়া, লঙ্ঘন করা। **অমৃতলোক**-স্বর্গ, বেহেশত। **কৈলাস**- হিন্দুধর্মের দেবতা শিবের বাসস্থান হিসেবে বর্ণিত হিমালয় পর্বতের উঁচু স্থান।

পাঠ-পরিচিতি : 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিচিত্র প্রবন্ধ* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এটি তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি লাইব্রেরিকে মহাসমুদ্রের কল্লোলধ্বনির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, লাইব্রেরিতে মানবাত্মার ধ্বনিরাশি বইয়ের পাতায় বন্দি হয়ে থাকে। বইয়ের ভেতর দিয়েই আমরা আকাশের দৈববাণী থেকে মহাত্মাদের কথা পেয়ে থাকি। যাঁদের সান্নিধ্য আমাদের কখনই পাওয়া সম্ভব নয়, বইয়ের ভেতর দিয়েই আমরা তাদের পেতে পারি। বই আমাদের অতীতের সাথে সেতুবন্ধ গড়ে দেয়। এ বইয়ের স্থান হলো লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিতেই মানব হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শোনা যায়। লাইব্রেরিতে সকল পথের, সকল মতের মানুষের সম্মিলন ঘটে। লাইব্রেরির মহত্ত্বের কথা বর্ণনা করে লেখক বলেছেন– জগতের উদ্দেশ্যে কি আমাদেরও কিছু বলার নেই? আমরা কি কেবল তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কলহ করে বেড়াব। লেখক শেষে আশা ব্যক্ত করে বলেছেন– বাঙালিরা জেগে উঠেছে। তারাও আপন ভাষায় লিখে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলবে। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বই পড়ার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি আমাদের বই পাঠ এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার এলাকার বা তোমার দেখা বা তুমি ব্যবহার কর এমন একটি পাঠাগার বা লাইব্রেরির পরিচয় দাও।

২. তোমাদের স্কুলের পাঠাগারটি কিভাবে আরও উন্নত করা যায়– সে বিষয়ে প্রস্তাব দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে লেখক মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলের সাথে কিসের তুলনা করেছেন?

ক. মানবাত্মার খ. আলোকের
গ. লাইব্রেরির ঘ. সংগীতের

২। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে 'সহস্র পথের চৌমাথা' – বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বহু জ্ঞানের সম্মিলন গ. বহু হৃদয়ের সম্মিলন
খ. বহু রাস্তার সম্মিলন ঘ. বহু জীবনের সম্মিলন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

হিন্দু মুসলমান বাঙালি। জন্মমৃত্যুর বন্ধনে অভিন্ন সত্তা।

৩। উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের কোন ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. হিংসা খ. বিদ্বেষ
গ. সংহতি ঘ. ঘৃণা

৪। উদ্দীপকে যে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত রয়েছে তা 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের যে বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে তা হলো –

i. জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে।
ii. বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত একসঙ্গে থাকে।
iii. সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লয় হইয়া বাস করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

একজনের পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। সেজন্য একেকজন একেক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে-ব্যক্তি যে-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার বদৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। সেই থেকে প্রয়োজন দেখা দেয় জ্ঞান সংরক্ষণের।

ক. কীসের মধ্যে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়?
খ. 'জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে' – কথাটি বুঝিয়ে বল।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জ্ঞান সংরক্ষণের কারণটি 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের আলোকে তুলে ধর।
ঘ. "মানব হৃদয়ের বন্যাকে বেঁধে রাখার প্রয়োজনীয় দিকটিই যেন উদ্দীপক ও 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য" — বিশ্লেষণ কর।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

[**লেখক-পরিচিতি :** প্রমথ চৌধুরী ৭ই আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল *বীরবল*। তাঁর সম্পাদিত *সবুজপত্র* বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নীললোহিত, সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ* ইত্যাদি। প্রমথ চৌধুরী ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।]

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্‌বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে কেননা আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনিই যাই বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজারদর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উলটো বুঝে প্রতি জনেই হতে চায় বড়োমানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে,

সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ: তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তা হলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই। এমনকি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমতবিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য

অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও-বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তা হলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন 'আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক' ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা-শাস্ত্রের একজন জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers; অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায় নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে,

তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল। অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর— সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে,উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ-মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে

আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম।সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়। ❑ [সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা : শৌখিন- রুচিবান। **উদ্বাহু-** উর্ধ্ববাহু। আহ্লাদে হাত ওঠানো। **ডেমোক্রেসি-** গণতন্ত্র। **সন্দিহান-** সন্দেহযুক্ত। **সুসার-** প্রাচুর্য, সচ্ছলতা, সুবিধা। **জজ-** বিচারক। **ভাঁড়েও ভবানী-** রিক্ত, শূন্য। **আবহমানকাল-** চিরকাল। **সোল্লাসে-** আনন্দে। **অবগাহন-** সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল। **উপায়ান্তর-** অন্য কোনো উপায়। **স্বশিক্ষিত-** নিজে নিজে শিক্ষিত। **প্রচ্ছন্ন-** গোপন। **জীর্ণ-** হজম। **অব্যাহতি-** মুক্তি। **গতাসু-** মৃত। **গলাধঃকরণ-** গিলে ফেলা। **কারদানি-** বাহাদুরি। **উদরপূর্তি-** পেট ভরানো। **ডেমোক্রেটিক-** গণতান্ত্রিক। **দাতাকর্ণ-** মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তীপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ। **কেতাবি-** কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

পাঠ-পরিচিতি : 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর *প্রবন্ধ সংগ্রহ* থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। আমাদের পাঠচর্চার অনভ্যাস যে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ঘটছে তা সহজেই লক্ষণীয়। আর্থিক অনটনের কারণে অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য বই পড়ার প্রতি লোকের অনীহা দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া দরকার। কারণ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বাধ্য না হলে লোকে বই পড়ে না। লাইব্রেরিতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাহিত্যচর্চা করা আবশ্যক বলে লেখক মনে করেন। 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি এই শিক্ষাই দেয় যে, জাতির মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বই পড়া, জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. তোমাদের স্কুলের বইপড়া প্রতিযোগিতা তোমার শিক্ষাজীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা উল্লেখ কর।

২. বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে তোমার প্রস্তাব দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে কীসের ওপর স্থান দিয়েছেন?

ক. হাসপাতালের খ. স্কুল-কলেজের
গ. অর্থ-বিত্তের ঘ. জ্ঞানী মানুষের

২। স্বশিক্ষিত বলতে কী বুঝায়?

ক. সৃজনশীলতা অর্জন গ. বুদ্ধির জাগরণ
খ. সার্টিফিকেট অর্জন ঘ. উচ্চ শিক্ষা অর্জন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

'পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।'

৩। উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যে বিদ্যমান?

ক. জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার নয়।
খ. শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না।
গ. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
ঘ. আমাদের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই।

৪। উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে ভাবকে নির্দেশ করে তা হলো –

i. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মৌলিকত্ব অর্জন
ii. শিক্ষাযন্ত্রের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া
iii. শিক্ষকের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাতীয় জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতোই দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক; অপরদিকে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ। অপরদিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না।

ক. 'ভাঁড়েও ভবানী' অর্থ কী?
খ. অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকে পরমার্থ বৃদ্ধির প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতকে সমর্থন করে"— মন্তব্যটির বিচার কর।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে এফ.এ. শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে। তিনি কিছুদিন ভবঘুরে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে ভাগ্যের সন্ধানে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকরি করেন। প্রবাস জীবনেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু এবং তিনি অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে সাহিত্য-সাধনা করতে থাকেন। গল্প, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, *বড়দিদি, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লিসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন* ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা–প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর – সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ির দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোনো শোকের ব্যাপার–এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটির-প্রাঙ্গণে গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা,–সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড়–নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল,

মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো–আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী পরিজন–সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ– দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,– এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে–মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল– দুটি আলতায় রাঙানো। উর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ বাবা,–বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কৈ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নি মরছে তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে !– চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!

হাঃ–ধোঁ লেগেছে বৈ ত না ! তুই কাঁদতেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,–শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোটো, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড়ো হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বৈ কি! কৈ, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়েসের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্‌ণ ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গীসাথিদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে।

একহাতে গলা জড়াইয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই–

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুন রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এত বড়ো ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুত সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজি হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক গে, –আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে।

রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া –

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র– সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়– নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই– কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্‌ণ মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনি। সেই রথ, সেই রাঙ্গা পা-টি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধুলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সে ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কি মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ–বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেই পাইল না, তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটোজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন,—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্নগ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হই ত এতেই হবো, বাগদি-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হলো না বাবা আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভালো হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারায় জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ-সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো ! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলোর প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালে কেন!

এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙালার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

২০১৫

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটা কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,–কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটির-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ, দারোয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দারোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দারোয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মার তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দারোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ বাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানিটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি- বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দারোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা, খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল,–আমার মা মরেচে–বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে ! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে ! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে ! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার !

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়,—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়।—এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্‌চার্যমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত,–শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : মুখুয্যে – মুখোপাধ্যায় পদবীর কথ্যরূপ। **বর্ষীয়সী** – অতি বৃদ্ধ, সকলের মধ্যে বয়সে বড়, স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। **সঙ্গতিপন্ন** – অর্থ-সম্পদের অধিকারী। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** – মৃত ব্যক্তির সৎকার, মৃত্যের জন্য অন্তিম বা শেষ অনুষ্ঠান। **সগ্য** – স্বর্গ শব্দের কথ্যরূপ। **অন্তরীক্ষ** – আকাশ, গগন। **ভুক্তাবশেষ** – ভোজন বা খাওয়ার পরে পাতে যা পড়ে থাকে। **প্রসন্ন** – সন্তুষ্ট, খুশি। **প্রসন্নমুখ** – খুশি ভরা মুখ। **ক্রোড়** – কোল। **শশব্যস্ত** – খরগোশ বা শশকের মতো ব্যস্ত। **তেনার** – তার, তাঁর। **দুলে** –পালকি বহনকারী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, নিচু জাতের মানুষ বলে অভিহিত। **ইন্দ্রজাল** – জাদুবিদ্যা, এখানে গল্পের মাধ্যমে মুগ্ধ বা মোহিত করে রাখার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। **রোমাঞ্চ** – শিহরণ, অনুভূতির আধিক্যে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া। **ভগ্নকণ্ঠ** – বিকৃত স্বর, এখানে অতি আবেগে কাঙালীর ভাঙা বা বিকৃত স্বরে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। **প্রণামী**–পুরোহিত বা দেব-দেবীকে দেওয়া সালামি। এখানে কবিরাজকে চিকিৎসা ফি হিসেবে দেওয়া টাকা বোঝানো হয়েছে। **মুষ্টিযোগ** – টোটকা চিকিৎসা। **গেঁটে কড়ি** – কাঁটাযুক্ত শামুক জাতীয় প্রাণি। **নিস্তব্ধ** – নিশ্চল, নিঃসাড়। নির্বাক। **হরিধ্বনি** – হরি নামের ধ্বনি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহ বহন করার সময় সমবেতকণ্ঠে দেবতা হরির নাম উচ্চৈঃসরে বলে থাকে একে হরিধ্বনি বলে। **সংস্কার** – বিশ্বাস, ঝোঁক, আজন্ম লালিত ধারণা। **অশন** – খাদ্যদ্রব্য, আহারের বস্তু। **সন্ধ্যাহ্নিক** – সন্ধ্যাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যকরণীয় পূজা।

পাঠ-পরিচিতি : সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পটি সংকলন করা হয়েছে। গরিব-দুখী নীচু শ্রেণির ছেলে কাঙালী। তার মা অভাগী। প্রতিবেশী উঁচু জাতের বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পর সৎকারের দৃশ্য দেখে অভাগীর ভেতরকার ভাবানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয় এ গল্প। মৃতের শবযাত্রার আড়ম্বরতা ও সৎকারের ব্যাপকতা দেখে অভাগীও নিজের মৃত্যু মুহূর্তের স্বপ্ন দেখে। চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা, অগ্নির ধোঁয়ায়

মুখুয্যে বাড়ির গিন্নি স্বর্গে গমন করেছেন। দুখিনী অভাগীও ভাবে তার মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধূলি নিয়ে মৃত্যু শেষে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর সময় কাঙালী তার বাবাকে হাজির করতে পারলেও পারেনি কাঠের অভাবে মায়ের সৎকার করতে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমানবিক জাতিভেদ প্রথা এবং জমিদারি ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন। এ গল্প জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে মানবিক হওয়ার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার দেখা ধনী পরিবারের কারো মৃত্যু ও গরিব পরিবারের কারো মৃত্যুর তুলনামূলক বিবরণ দাও।

২. কাঙালী যে মাতৃভক্তি দেখিয়েছে, এরকম কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন নদীর তীরে শশ্মানঘাট অবস্থিত?

ক. শঙ্খ খ. গরুড়
গ. গড়াই ঘ. পদ্মা

২। রসিক বেল গাছটি কী কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল?

ক. অভাগীর শবদাহ খ. ঘরবাড়ি তৈরি
গ. রান্নার কাঠ সংগ্রহ ঘ. কাঙালীর জন্য

উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি শুধবি কীভাবে? গফুর বলিল, যেমন করে পারি শুধব বাবা ঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

৩। তর্করত্ন অভাগীর স্বর্গ গল্পের কোন্ চরিত্রের প্রতিনিধি?

ক. ঠাকুর দাস মুখুজ্যে খ. রসিক দুলে
গ. দারোয়ান ঘ. অধর

সৃজনশীল প্রশ্ন

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুর যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম। কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন? কেঁদে কেটে হাতে পায়ে পড়ে বললাম, বাবু মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাব কোথায়? আমাকে পণদশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই। বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাখার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ যে মরে যাবে।

ক. কাঙালীর বাবার নাম কী?

খ. 'তোর হাতের আগুন যদি পাই, আমিও সগ্যে যাব' – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের যে সমাজচিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কাঙালীর সঙ্গে উদ্দীপকের গফুরের সাদৃশ্য থাকলেও কাঙালী সম্পূর্ণরূপে গফুরের প্রতিনিধিত্ব করে না'— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

নিরীহ বাঙালি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

[**লেখক-পরিচিতি :** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। ছোটবেলায় বড় বোন করিমুন্নেসা বেগম রোকেয়াকে বাংলা শিক্ষায় সাহায্য করেন। পরে তিনি বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শেখেন। বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নামে পরিচিত হন। স্বামীর প্রেরণায় তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। সমকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন। মুসলিম নারী জাগরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও আনজুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। *পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।]

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়সিক্ত বাঙালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যুথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা– এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙালি গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা–যদি ভারতবর্ষকে ইংরেজি ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙালি তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙালি তাহাতে পদ্মিনী। যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙালি পুরুষিকা! অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি –পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল–অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি –ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা–অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল–রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক–সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেশে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চালনের (ventilation এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়।

কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী–হেমাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গীগণ তদানুকরণে ইংরেজ ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম 'হাওয়ার শাড়ি' পরেন। বাঙালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুটি চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দাবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য–নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা রূপা বা হিরা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষত আজি কালি কোন জিনিসটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়–পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাসের মূল্য কত জান ? "অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম.এ. পাশ অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য–এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙালি কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য (agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C পাশ করা সহজ। আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তাতে আমাদের কি?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা :

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc ও D.Sc পাশ করা সহজ।

(৩) অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড়ো লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) কালিডর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose and Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য–আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ-তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসি দাও!

আমরা সকলেই কবি–আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটিজুতা" –কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নতুন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা–"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ–প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : সৌকুমার্য- সৌন্দর্য। **ঝঞ্ঝাবাতে**- ঝঞ্ঝার বাতাসে। **কুন্তলীন, কেশলীন**- লেখকের আমলে জনপ্রিয় চুলে দেয়ার তেলের নাম। **হাওয়ার শাড়ি**- সূক্ষ্ম সুতোর শাড়ি। পাতলা শাড়ি। **তণ্ডুল**- চাল। **কালিডর, মিল্ক অভ রোজ, ভিনোলিয়া পাউডার**- সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী। **দিব্যাঙ্গনা**- স্বর্গের রূপসী। হুরপরি। **শুভ্রনীলাম্বর**- পরিষ্কার নীল আকাশ। **সাশ্রুসজলনয়ন**- জলভরা চোখ। **আত্মপ্রশংসা**- নিজের প্রশংসা।

পাঠ-পরিচিতি : 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটিতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি নারী পুরুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক হাস্য-রসাত্মকভাবে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি পুরুষগণের অলসপ্রিয়তা, শারীরিক পরিশ্রমে অনীহা, বাগাড়ম্বর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা যেমন রয়েছে, তেমনি নারীদের অহেতুক রূপচর্চা, পরচর্চা এবং নিজেদের অবলা প্রমাণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রতি আলোচনাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গাত্মক এ প্রবন্ধের মাধ্যমে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি পুরুষ ও নারীকে সত্যিকার সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় কাজে প্রণোদিত করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটি আমাদের ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি মনোযোগী হবার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. 'নিরীহ বাঙালি' পাঠটিতে (যে সময়ের) বাঙালির যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কাকে মূর্তিমান কাব্য বলেছেন?

ক. নারীকে   খ. পুরুষকে
গ. বাঙালিকে   ঘ. ইংরেজদের

২। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখিকা 'পাস বিক্রয়' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ক. শিক্ষাকে   খ. ব্যক্তিকে
গ. ব্যক্তিত্বকে   ঘ. মূল্যবোধকে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

কর্মস্পৃহার অভাবে আজ আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে, তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি।

৩। উদ্দীপকে নিরীহ বাঙালি প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের প্রতিফলিত দিকটি হলো –

i. ভোজনপ্রিয়তা
ii. অলসতা
iii. কর্মবিমুখতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪। এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি আজ কোন পরিচয়ে পরিচিত?

ক. মূর্তিমান
খ. পদ্মিনী
গ. পুরুষিকা
ঘ. নায়িকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, 'ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

ক. কোন জাতীয় পোশাককে ইংরেজ ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ বলা হয়েছে?
খ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালিকে 'মূর্তিমান কাজ' বলেছেন কেন?
গ. নন্দলালের বৈশিষ্ট্য 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে যাদের কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করে তাদের স্বরূপ তুলে ধর।
ঘ. উদ্দীপকে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের উপেক্ষিত দিকটি বিশ্লেষণ কর।

পল্লিসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

[**লেখক-পরিচিতি :** মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১০ই জুলাই ১৮৮৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ডি. লিট. লাভের গৌরব অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত ছিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সুপণ্ডিত ও ভাষাবিদ। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দুরূহ ও জটিল সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খণ্ড)* এবং *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যতম কালজয়ী সম্পাদনা গ্রন্থ *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। শিশু পত্রিকা *আঙুর* তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ এবং নানা মৌলিক রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ সালে ঢাকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনাবসান ঘটে।]

পল্লিগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই। চারদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুলকুল ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিময় হিলাদুলা প্রচুর পরিমাণে শহরের অভাব এখানে পূর্ণ করে দিচ্ছে। পল্লির ঘাটেমাঠে, পল্লির আলোবাতাসে, পল্লির প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই বায়ু- সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে কত বড়ো সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, সাহিত্যের কী এক অমূল্য খনি পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে। সুদূর পশ্চিমের সাহিত্যরসিক রোমাঁ রোলাঁ পর্যন্ত ময়মনসিংহের মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মনসুর বয়াতির মতো আরও কত পল্লিকবি শহুরে চক্ষুর অগোচরে পল্লিতে আত্মগোপন করে আছেন, কে তাঁদের সাহিত্যের মজলিসে এসে জগতের সঙ্গে চেনাশোনা করিয়ে দেবে? আজ যদি বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লি থেকে এইসব অজানা অচেনা কবিদের গাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হতো, তাহলে দেখা যেত বাংলার মুসলমানও সাহিত্য সম্পদে কত ধনী। কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?

আমরা পল্লিগ্রামে বুড়োবুড়ির মুখে কোনো ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাকালে যেসব কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেগুলি না কত মনোহর! কত চমকপ্রদ! আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু প্রভৃতির চেয়ে পল্লির উপকথাগুলোর মূল্য কম নয়। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শুনান না, তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ। ফলে কোনো সুদূর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই

রূপকথা নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে। যদি আজ বাংলার সমস্ত রূপকথা সংগৃহীত হতো, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, বাংলার নিভৃত কোণের কোনো কোনো পিতামহী মাতামহীর গল্প ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে কিংবা ভারত উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে এমনিভাবে প্রচলিত আছে। হয়তো এশিয়ার বাইরে ইউরোপখণ্ডে লিথোনিয়া কিংবা ওয়েলসের কোনো পল্লিরমণী এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিতভাবে সেই উপকথাগুলো তার ছেলেপুলে বা নাতি-পোতাকে শোনাচ্ছে। কে আছে এই উপকথাগুলো সংগ্রহ করে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে? ইউরোপ, আমেরিকা দেশে বড়ো বড়ো বিদ্বানদের সভা আছে, যাকে বলা হয় Folklore Society। তাদের কাজ হচ্ছে এইসব সংগ্রহ করা এবং অন্য সভ্য দেশের উপকথার সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়ে বিচার করা। এগুলো নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ বলে পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার থলে' যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের সমস্ত উপকথা এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো কয়েক বালামে তার সংকুলান হতো না।

আমরা Shakespeare-এ পড়েছি রাক্ষসদের বাঁধাবুলি হচ্ছে Fi, Fie, foh, fun! ও smell the blood of a British man- এর সঙ্গে তুলনা করে পল্লির 'হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ, এ সাদৃশ্য হলো কোথা থেকে? তবে কি একদিন ঐ সাদা ইংরেজ ও এই কালো বাঙালির পূর্বপুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করত? সে আজ কত দিনের কথা কে জানে? আমরা কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য জুড়ে দিই- যেমন 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই', 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', আপনি বাঁচলে বাপের নাম', এই রকম আরও কত কী! তারপর ডাকের কথা আছে, খনার বচন আছে।

যেমন ধরুন– কলা রুয়ে না কেটো পাত,

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

প্রবাদ বাক্যে এবং ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে? শুধু তাই নয়, জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা আজও বলি– 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।'এই প্রবাদ বাক্যটি সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল। কে এই প্রবাদ বাক্য, ডাক, খনার বচনগুলি সংগ্রহ করে তাদের চিরকাল জীবন্ত করে রাখবে?

তারপর ধরুন, ছড়ার কথা। কথায় কথায় ছেলেমেয়েগুলো ছড়া কাটতে থাকে। রোদের সময় বৃষ্টি হচ্ছে, অমনি তারা সমস্বরে ঝংকার দিয়ে ওঠে–

রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে,

খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে মনে করুন মায়ের সেই ঘুমপাড়ানী গান, সেই খোকা-খুকির ছড়া। এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস, কিন্তু আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই। ছড়াও ক্রমে লোকে ভুলে যাচ্ছে। কে এগুলিকে বইয়ের পাতায় অমর করে রাখবে?

শুধু ছড়া কেন? খেলাধুলার না কত বাঁধা গৎ আছে বা ছিল আমাদের এ দেশে। যখন ফুটবল, ব্যাটবলের নাম কারও জানা ছিল না, তখন কপাটি খেলার খুব ধুম ছিল। সে খেলার সঙ্গে কত না বাঁধা বুলি ছেলেরা ব্যবহার করত–

এক হাত বোল্লা বার হাত শিং
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং।

বিদেশি খেলার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এসব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। কে এদের বাঁচিয়ে রাখবে?

তারপর ধরুন, পল্লিগানের কথা। পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে এই গানগুলি অমূল্য রত্নবিশেষ। সেই জারি গান, সেই ভাটিয়ালি গান, সেই রাখালি গান, মারফতি গান- গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লির ঘাটে, মাঠে ছড়ানো রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো এখন বর্বর চাষার গান বলে ভদ্রসমাজে আর বিকায় না। কিন্তু–

মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

এই গানটির সঙ্গে আপনার শহুরে গানের কোনো তুলনা হতে পারে? কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সেগুলো সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টা হচ্ছে কি?

এ পর্যন্ত যা বললাম সেগুলো হচ্ছে পল্লির প্রাচীন সম্পদ। সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করবার মতো পল্লির নতুন সম্পদেরও অভাব নেই। আজকাল বাংলাসাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে, তার পনেরো আনা হচ্ছে শহুরে সাহিত্য, সাধু ভাষায় বলতে গেলে নাগরিক সাহিত্য। সে সাহিত্যে আছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মোটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দেবার কথা। এইসব কথা নিয়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক রাশি রাশি লেখা হচ্ছে। পল্লির গৃহস্থ কৃষকদের, জেলে-মাঝি, মুটে-মজুরের কোনো কথা তাতে ঠাঁই নাই। তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের পাপ-পুণ্য, তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষার কথায় কজন মাথা ঘামাচ্ছে? আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাটও একবার 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার পুরানো পথে নাগরিক সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ধানগাছে তক্তা হয় কিনা, এখন শহুরে লোকেরা এটা জানলেও পাড়াগাঁয়ের জীবন তাদের কাছে এক অজানা রাজ্য। সেটা কারো কাছে একেবারে পচা জঘন্য, আর কারো কাছে একেবারে চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে ঘেরা। তাঁরা পল্লির মর্মকথা কী করে জানবেন? কী করেই বা তার মুখচ্ছবিখানি আঁকবেন? আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়াবাংলা ঘর তুলতে। আজ অনেকের আত্মা ইট-পাথর ও লোহার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাচ্ছে। তাদের জন্য আমাদের কিছু গড়াগাঁথার দরকার আছে। ইউরোপ, আমেরিকায় আজ এই Proletariat সাহিত্য ক্রমে আদরের আসন পাচ্ছে, আমাদের দেশেও পাবে। কিন্তু কোথায় সে পল্লির কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক, যাঁরা নিখুঁতভাবে এই পল্লির ছবি শহরের চশমা-আঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?

এই সমস্ত রূপকথা, পল্লিগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলোবাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাতে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নেই। যেরূপ মাতৃস্তন্যে সন্তান মাত্রেরই অধিকার, সেরূপ এই পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার।

এক বিরাট পল্লিসাহিত্য বাংলায় ছিল। তার কঙ্কালবিশেষ এখনও কিছু আছে, সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে সে অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। নেহাত সেকেলে পাড়াগাঁয়ের লোক ছাড়া সেগুলোর আর কেউ আদর করে না। কিন্তু একদিন ছিল যখন নায়ের দাঁড়ি-মাঝি থেকে গৃহস্থের বউ-ঝি পর্যন্ত, বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত, আমির থেকে গরিব পর্যন্ত সকলকেই এগুলো আনন্দ উপদেশ বিলাতো। যদি পল্লিসাহিত্যের দিকে পল্লিজননীর সন্তানেরা মনোযোগ দেয়, তবেই আমার মনে হয় এরূপ পল্লিসাহিত্য সভার আয়োজন সার্থক হবে, নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : কলগান- শ্রুতিমধুর ধ্বনি। **পরতে পরতে-** স্তরে স্তরে। **ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন-** বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও সাধক দীনেশচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরী গ্রামে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। তাঁরই সুযোগ্য সম্পাদনায় চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে রামায়ণী কথা, বৃহৎবঙ্গ, বেহুলা, ফুল্লরা, জড়ভরত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। **রোমাঁ রোলাঁ-** (Roman Rolland) ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক। রোমাঁ রোলাঁর জন্ম ২৯শে জানুয়ারি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাস তাঁর অমূল্য কীর্তি। এ গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। **মদিনা বিবি-** মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকগাথা 'দেওয়ানা-মদিনা'র নায়িকা।

মনসুর বয়াতি- *দেওয়ানা-মদিনা* লোকগাথার প্রখ্যাত কবি। **আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ-** আরব্য উপন্যাসের অন্যতম চিত্তাকর্ষক গল্প 'আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ'। আলাউদ্দিন নামের এক সাহসী তরুণ এক চতুর জাদুকরের বিস্ময়কর প্রদীপ লাভ করে। আলাউদ্দিন ছিল গরিব এক দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলে। এ প্রদীপে ঘষা দিলেই এক মহাশক্তিধর দৈত্য এসে হাজির হতো এবং আলাউদ্দিনের আদেশ অনুযায়ী অলৌকিক কাজ করত। এভাবেই এ প্রদীপের বদৌলতে আলাউদ্দিন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়। মায়ের দুঃখও দূর হয়।

আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু- আরব্য উপন্যাসের অন্যতম বিখ্যাত গল্প। গরিব কাঠুরে আলিবাবা ভাগ্যক্রমে পাহাড়ের গুহায় দস্যুদলের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পায়। সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন এনে সে বাড়িতে রাখে। দস্যুদল আলিবাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে। আলিবাবা তার বুদ্ধিমতী বাঁদি মর্জিনার সহায়তায় এই দস্যুদলকে কাবু করে।

Lamb's Tales from Shakespeare- বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো চার্লস ল্যাম্ব সহজ ভাষায় কিশোরদের উপযোগী করে রূপান্তর করেন। সেই গ্রন্থেরই উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক- পুরাতত্ত্ববিদ। যিনি প্রাচীন লিপি, মুদ্রা বা ভগ্নাবশেষ থেকে পুরাকালের তথ্য নির্ণয় করেন।

Folklore Society- যে সমিতি লোকশিল্প ও গান, উৎসব-অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রচারের জন্য নানা কাজ করে থাকে। এ সমিতি লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত। উইলিয়াম থমস 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক। ১৮৪৮ সালে সর্বপ্রথম লন্ডনে এই সমিতি গঠিত হয়।

নৃতত্ত্ব (Anthropology)- মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার- প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও বাংলা লোকগাথা ও রূপকথার রূপকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম ১২৮৪ বঙ্গাব্দে, মৃত্যু ১৩৬৩ সনে। তিনি বাংলার নানা অঞ্চল ঘুরে বহু পরিশ্রম করে রূপকথা সংগ্রহ করেন। তাঁর রচিত *ঠাকুরমার ঝুলি* শিশুদের প্রিয় বই।

প্রবাদবাক্য- দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতি, যেমন, 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'।

খনা- প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত নারীজ্যোতিষী। বাংলাদেশের জলবায়ু-নির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রচিত বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার দেউলি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

বালাম- বইয়ের খণ্ড, ইংরেজি Volume। **ভূয়োদর্শন-** প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা। **বালাখানা-** প্রাসাদ। **Proletariat সাহিত্য-** অত্যাচারিত শ্রমজীবী দুঃখী মানুষের সাহিত্য। **ফক্কিকার-** ফাঁকিবাজি।

পাঠ-পরিচিতি : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে তিনি যে অভিভাষণ দেন, তারই পুনর্লিখিত রূপ এই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধটি। আলোচ্য প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলার পল্লিসাহিত্যের বিশেষ কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, একদিন এক বিরাট পল্লিসাহিত্য বাংলাদেশে ছিল, আজ উপযুক্ত গবেষক এবং আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগ ও চেষ্টায় সেই সম্পদগুলো সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য এ কাজ একান্ত আবশ্যক। প্রবন্ধটি আবহমান কালের বাঙালি, বাংলাদেশ, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সকলকে সচেতন হতে উৎসাহিত করে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা তৈরি কর।

২. পাঁচটি খনার বচন লিখ।

৩. বর্ষায় পল্লির প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে কী?

ক. উপকথা　　খ. প্রবাদ
গ. ছড়া　　ঘ. পল্লিগান

২। 'কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?– মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ হতাশা দূর হতে পারে কীভাবে?

ক. স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে
খ. সভা-সমিতিতে যথাযথ উপস্থাপন করে
গ. ফোকলোর সোসাইটি স্থাপন করে
ঘ. জনসাধারণকে সচেতন করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

ষোল চাষে মুলা
তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান

৩। উদ্দীপকটির ধরন হলো –

ক. প্রবাদ প্রবচন
খ. খনার বচন
গ. ডাকের কথা
ঘ. লোকগাথা

সৃজনশীল প্রশ্ন

এ লেভেল পরীক্ষা শেষে মিতু মা-বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসে। গ্রামে তখন পৌষ মেলা বসেছে। মেলায় মিতু বয়াতির কণ্ঠে 'একটা ছিল সোনার কইন্যা, মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কইন্যার দেশ' গানটি শুনে বিমোহিত হয়। সে তার মা'কে জিজ্ঞাসা করে– মা এতদিন কেন আমি এ গানগুলো শুনিনি। এ গানগুলোই তো বড় আপু খুঁজছে তার থিসিসের জন্য। আমি এবার আপুর জন্য গানগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।

ক. সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কোনটি?

খ. আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. মিতুর এ গানগুলো না শোনার কারণটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের মিতুই যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়া পল্লি জননীর মনোযোগী সন্তান'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উদ্যম ও পরিশ্রম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

[**লেখক-পরিচিতি:** মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ সালে মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোর জেলার হাজীগ্রামে। তিনি প্রথমে শিক্ষক এবং পরে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি ডাক্তার লুৎফর রহমান নামে পরিচিত ছিলেন। নারী সমাজের উন্নতির জন্য নারীতীর্থ নামে সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং নারীশক্তি নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সহজবোধ্য কিন্তু ভাবগম্ভীর। তিনি মহৎ জীবনের লক্ষ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে মহৎ চিন্তাচেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গভীর জীবনবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং আত্মসম্মান ও মর্যাদার প্রতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার প্রসাদগুণ। *উন্নত জীবন*, *মহৎ জীবন*, *উচ্চ জীবন*, *সত্য জীবন*, *মানব জীবন*, *প্রীতি উপহার* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি কবিতা, উপন্যাস ও ছোটদের বই রচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।]

চাকরি করা উত্তম, যখন তা হয় জাতির সেবা– যখন তাতে মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। যখন জীবন ধারণের সম্বল হয়ে পড়ে চাকরি-যখন সেটাকে দেশ–সেবা বলে মনে হয় না, তখন তা কোরো না। সত্য ও আইন অপেক্ষা উপরিস্থ কর্মচারীকে যদি বেশি মানতে হয়, তা হলে সরে পড়। প্রভুর সামনে যদি মনের বল না থাকে, কঠিনভাবে সত্য বলতে না পার, প্রয়োজন হলেই চাকরি ছেড়ে দেবার সঙ্গতি না থাকে– তাহলে বুঝব চাকরি করে তুমি পাপ করেছ।

মনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে না পারলে তোমাতে ও পশুতে প্রভেদ থাকবে না– জীবন তোমার মিথ্যা হবে। স্বাধীন হৃদয়, সত্যের সেবক কামার হও, সেও ভালো। নিজকে যন্ত্র করে ফেলো না।

সৎ, জ্ঞানী ও মহৎ যিনি, তিনি নিজকে ব্যক্তিত্বহীন করতে ভয়ংকর লজ্জা বোধ করেন। তিনি তাতে পাপ বোধ করেন।

চাকরি করে অন্যায় পয়সায় ধনী হবার লোভ রাখ? তোমার চেয়ে মুদি ভালো। মুদির পয়সা পবিত্র। অনেক যুবক থাকতে পারে, যারা মনে করে কোনোরকম একটা চাকরি সংগ্রহ করে সমাজের ভেতরে আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই হলো। চুরির সাহায্যেই হোক বা অসৎ উপায় অবলম্বন করেই হোক, ক্ষতি নেই।

চরিত্র তোমার নিষ্কলঙ্ক– সামান্য কাজ করে পয়সা উপায় কর, তাতে জাত যাবে না। চুরি অন্যায়ের সাহায্যে যে বাঁচতে চেষ্টা করে, তারই জাত যায়, অসৎ উপায়ে আয় কোরো না, মিথ্যার আশ্রয় নিও না। লোককে কায়দায় ফেলে অর্থ সংগ্রহ করতে তুমি ঘৃণা বোধ কোরো।

ইউরোপের জ্ঞানগুরু প্লেটো মিসর ভ্রমণকালে মাথায় করে তেল বেচে রাস্তা-খরচ জোগাড় করতেন। যে কুঁড়ে, আলসে, ঘুষখোর ও চোর, সেই হীন। ব্যবসা বা ছোটো স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না– হীন হয় মিথ্যা চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়। পাছে জাত যায়, সম্মান নষ্ট হয়– এই ভয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছ? সম্মান কোথায়, তা তুমি টের পাওনি?

সৎ উপায়ে যে পয়সা উপায় করা যায় তাতে তোমার আত্মার পতন হবে না। তোমার আত্মার পতন হবে আলস্যে ও অসাধুতায়। তোমারই স্পর্শে কাজ গৌরবময় হবে।

আমাদের দেশের লোক যেমন আজকাল বিলেতে যায় এককালে তেমনি করে বিলেতের লোক গ্রিস ভ্রমণে যেত।

বিলেত-ফেরত লোককে কেউ ইট টেনে বা কুলির কাজ করে পয়সা উপায় করতে দেখেছে?

বিলেতের এক পণ্ডিত দেশভ্রমণ দ্বারা অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন– গ্রিকদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি আরম্ভ করলেন এমন কাজ, যা তুমি আমি করতে লজ্জাবোধ করব। তাতে কি তাঁর জাত গিয়েছিল? যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, সে কয়দিন নিচে পড়ে থাকে? লোকে তাঁকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই।

কাজে মানুষের জাত যায় না– এটা বিশ্বাস করতে হবে। কাজহীন হও ঐ সময় যখন কাজের ভেতর অসাধুতা প্রবেশ করে, আর কোনো সময়েই নয়।

বিশ্ব-সভ্যতার এত দান তুমি ভোগ কর এসব কী করে হলো? হাতের সাহায্যে নয় কি? কাজকামকে খেলো মনে করলে চলবে না। মিস্ত্রির হাতুড়ির আঘাত, কামারের কপালের ঘাম, কুলির কোদালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখো।

অনেকে বলে, তাদের জন্য কোনো কাজ নেই। যে কাজই তারা করুক, যে দিকেই তারা হাঁটুক– কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা! মূর্খ যারা তারাই এ কথা বলে। তাদের এ ব্যর্থতার জন্য তারা নিজে দায়ী! এই নৈরাশ্যের হা-হুতাশ তাদেরই অমনোযোগ আর কুঁড়েমির ফল।

ডাক্তার জনসন মাত্র কয় আনা পয়সা নিয়ে লন্ডনের মতো শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, অথচ তিনি কারও কাছে কোনো হাত পাতেননি। এক বন্ধু তাঁকে এক সময় এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন। অপমানবোধ করে তিনি সে জুতো পথে ফেলে দিয়েছিলেন। উদ্যম, পরিশ্রম ও চেষ্টার সামনে সব বাধাই পানি হয়ে যায়। এ গুণ যার মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি পরিশ্রমী, তার দুঃখ নেই। জনসনকে অনেক সময় রাত্রিতে না খেয়ে শুয়ে থাকতে হতো, তাতে তিনি কোনোদিন ব্যথিত বা হতাশ হননি। বাধাকে চূর্ণ করে বীরপুরুষের মতো তিনি যে কীর্তি রেখে গিয়েছেন, তা অনেক দেশের অনেক পণ্ডিতই পারবেন না।

গুণ থাকলেও চেষ্টা না করলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। আরভিং সাহেব বলেছেন, চুপ করে বসে থাকলে কাজ হবে না। চেষ্টা কর, নড়াচড়া কর, এমন কি কিছু-নাড়, ভেতর কিছু ফলাতে পারবে। কুকুরের মতো চিৎকার কর, সিংহ হয়েও ঘুমিয়ে থাকলে কী লাভ?

পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছ, তারপর মনে হচ্ছে তোমার মূল্য এক পয়সা নয়। জিজ্ঞাসা করি, কেন? জান না, এ জগতে যারা নিতান্ত আনাড়ি তারা মাসে হাজার হাজার টাকা উপায় করছে?

তোমার এই মর্মবেদনা ও দুঃখের কারণ তুমি মূর্খ। মানুষ বালিতে সোনা ফলাতে পারে, এ তুমি বিশ্বাস কর না? তুমি কুঁড়ে, তোমার উদ্যম নেই, তুমি একটা আত্মপ্রত্যয়হীন অভাগা।

কাজ ছোটো হোক, বড়ো হোক, প্রাণ-মন দিয়ে করবে। মূল্যহীন বন্ধুগণের লজ্জায় কাজকে ঘৃণা কোরো না। সকল দিকে, সকল রকমে তোমার কাজ যাতে সুন্দর হয় তার চেষ্টা করবে।

ফক্স সাহেবকে এক সময় এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনার লেখা ভালো নয়। কাজের চারুতার প্রতি তাঁর এত নজর ছিল যে, তিনি সেই দিন থেকে স্কুলের বালকের ন্যায় লেখা আরম্ভ করলেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর লেখা চমৎকার হয়ে গেল।

উন্নতির আর এক কারণ হচ্ছে দৃষ্টি ও মনোযোগ। এক ভদ্রলোকের খানিক জমি ছিল। জমিতে লাভ তো হতই না, বরং দিন দিন তাঁর ক্ষতি হচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে নামমাত্র টাকা নিয়ে তিনি এক ব্যক্তিকে জমিগুলো ইজারা দিলেন। কয়েক বছর শেষে ইজারাদার এক দিন ভূস্বামীকে বললেন, যদি জমিগুলো বিক্রয় করেন তাহলে আমাকেই দেবেন। আপনার কৃপায় এই কয় বছরে আমি অনেক টাকা জমা করতে সক্ষম হয়েছি। ভূস্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কয় বছরের ভেতর যে জমিতে আমি একটা পয়সা উপায় করতে পারিনি, সেই জমি মাত্র কয়েক বছর চাষ করেই খরিদ করতে সাহস করছ? সে বলল, আপনার মতো অমনোযোগী ও বাবু আমি নই। পরিশ্রম ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমানো আমার অভ্যাস নয়।

এক যুবক স্কট সাহেবের কাছে উপদেশ চেয়েছিল। যুবককে তিনি এই উপদেশ দেন : কুঁড়েমি কোরো না, যা করবার, তা এখনই আরম্ভ কর। বিশ্রাম যদি করতে হয় কাজ সেরে করবে।

সময়ের যারা সদ্‌বহার করে, তারা জিতবেই। সময়েই টাকা, সময় টাকার চেয়ে বেশি। জীবনকে উন্নত করো কাজ করে। জ্ঞান অর্জন কর। চরিত্রকে ঠিক করে বসে থাক। কৃপণের মতো সময়ের কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নাও।

এক ঘণ্টা করে প্রতিদিন নষ্ট কর, বৎসর শেষে গুণে দেখ, অবহেলায় কত সময় নষ্ট হয়েছে। এক ঘণ্টা করে প্রতিদিন একটু করে কাজ কর, দেখবে বৎসর শেষে, এমনকি মাসে কত কাজ তোমার হয়েছে। তোমার কাজ দেখে তুমি নিজেই বিস্মিত হবে। প্রতিদিন তোমার চিন্তা একখানা কাগজে বেশি নয়-দশ লাইন করে ধরে রাখ, দেখবে বছর শেষে তুমি একখানা সুচিন্তিত চমৎকার বই লিখে ফেলেছ। জীবনকে ব্যবহার কর, দেখবে মৃত্যু জীবনের হাজার কীর্তির নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। জীবন আলস্যে, বিনা কাজে কাটিয়ে দাও, মৃত্যুকালে মনে হবে জীবনে তোমার একটা মিথ্যা লীলার অভিনয় ছাড়া আর কিছু হয় নি– একটা সীমাহীন দুঃখ ও হা-হুতাশের সমষ্টি! জীবন শেষে যদি বলো, 'জীবনে কী করলাম? কিছু হলো না' তাতে কী লাভ হবে? কাজের প্রারম্ভে ভেবে নিও, তুমি কোন কাজের উপযোগী, জগতে কোন কাজ করবার জন্য তুমি তৈরি হয়েছ– কোন কাজে তোমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করে।

সাধুতা ও সত্যের ভেতর দিয়ে যেমন উন্নতি লাভ করা যায়, এমন আর কিছুতে নয়। সত্য এবং সাধুতাকে লক্ষ্য রেখে ব্যবসা কর, তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জুয়াচুরি করে দু দিনের জন্য তুমি লাভবান হতে পার, সে লাভ দু দিনের। জগতে যে সমস্ত মানুষ ব্যবসাতে উন্নতি করেছেন তাঁদের কাজেকামে কখনও মিথ্যা, জুয়াচুরি ছিল না। ব্যবসা, ভালো কাজ-এর ভেতর অমর্যাদার কিছু নেই। অগৌরব হয় হীন পরাধীনতায়, মিথ্যা ও অসাধুতায়।

এক ব্যক্তি মুদি জীবনের লজ্জা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল। মরবার আগে একখানা কাগজে লিখে রেখে গিয়েছিল– 'এ হীন জীবন আমার পক্ষে অসহনীয়।' তার মৃত্যুতে আমাদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক হয় না। লোকটি এত হীন ছিল যে, তার মুদি হয়ে বাঁচবারও অধিকার ছিল না। কাজকাম বা ব্যবসাতে অগৌরব নেই। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নবাব বংশের নাম পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলিমউল্লাহ্ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। জাতির কল্যাণ হয় ব্যবসার ভেতর দিয়ে। ব্যবসাকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না সে মূর্খ। ইংরেজ জাতির এই গৌরব-গরিমার এক কারণ ব্যবসা। ব্যবসা না করলে তারা এত বড় হতে পারত না।

যে জিনিস নিজে কিনলে ঠকেছ বলে মনে হয়, সে জিনিস ক্রেতাকে কখনও দিও না। কখনও অনভিজ্ঞ ক্রেতাকে ঠকিও না। হয়তো মনে হবে তোমার লোকসান হলো, কিন্তু না, অপেক্ষা কর, তোমার সাধুতা ও সুনাম ছড়াতে দাও, লোকসানের দশগুণ এসে তোমার পকেটে ভর্তি হবে।

ব্যবসার ভেতর সাধুতা রক্ষা করে কাজ করায় অনেকখানি মনুষ্যত্বের দরকার। যে ব্যবসায়ী লোভ সংবরণ করে নিজের সুনামকে বাঁচিয়ে রাখে, সে কম মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। মিষ্ট ও সহিষ্ণু ব্যবহার, ভদ্রতা এবং অল্প লাভের ইচ্ছা তোমার ব্যবসায়ী জীবনকে সফল করবে।

অনবরত চাকরির লোভে যুবকেরা সোনার শক্তিভরা জীবনকে বিড়ম্বিত করে দিচ্ছে। মিস্ত্রি, কামার, শিল্পী, দরজি এরা কি সত্যই নিম্নস্তরের লোক? অশিক্ষিত বলেই কি সভ্য সমাজে এদের স্থান নেই? যা তুমি সামান্য বলে অবহেলা করছ, তা কতখানি জ্ঞান, চিন্তা ও সাধনার ফল তা কি ভেবে দেখেছ? শিক্ষিত ব্যক্তি যে কোনো কাজই করুক না, তার সম্মান, অর্থ দুই-ই লাভ হবে। আত্মার অফুরন্ত শক্তিকে মানুষের কৃপাপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ করে দিয়ো না। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : ব্যক্তিত্ব– ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। **নিষ্কলঙ্ক–** নির্মল। **প্লেটো** (খ্রি.পূ. ৪২৭-৩৪৭)- শিক্ষাব্রতী ও সত্যানুসন্ধানী প্লেটো ৩৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে একাডেমি নামে এথেন্সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষামূলক গবেষণায় ব্রতী হন। রিপাবলিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। প্লেটোর মতে, ব্যক্তিত্বের মান বা জীবনের সার্থকতা কী? তাঁর কথায় Only an examined life is worthliving অর্থাৎ পরীক্ষিত জীবনই সার্থক জীবন-আত্মজ্ঞানের দ্বারা পরিশীলিত জীবনবোধই ব্যক্তিসত্তার ধারক ও বাহক। **অসাধুতা–** প্রতারণা, অসৎকাজ। **খেলো–** মূল্যহীন, নিকৃষ্ট।

ড. জনসন- (Dr. Samuel Johnson : ১৭০৯-১৭৮৪)-একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক ও ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান সংকলক। তিনি বহু প্রখ্যাত অভিধান প্রণেতা। Dictionary, Vanity of Human Wishes, Rasselas, Prince of Abyssinia, Lives of the Poets ইত্যাদি গ্রন্থের জন্য তিনি স্মরণীয়।

আরভিং- (Washington Irving : ১৮৮৩-১৯৫৯)-একজন আমেরিকান লেখক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম 'রিপ ভ্যান উইংকল।'

স্কট- (Sir Walter Scott : ১৭৭১-১৮৩২)- ইংরেজি ভাষায় প্রখ্যাত স্কটিশ ঔপন্যাসিক ও গাথা রচয়িতা। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আইভানহো'।

হা-হুতাশ- আক্ষেপধ্বনি। **উদ্রেক**-উদয়, সঞ্চার। **গৌরব**-গরিমা, মর্যাদা, গর্ব। **বিড়ম্বিত**-দুঃখপ্রাপ্ত। **ব্যর্থ**-নিষ্ফল।

পাঠ-পরিচিতি : 'উদ্যম ও পরিশ্রম' নিবন্ধটি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের উন্নত *জীবন* গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ থেকে সংগৃহীত। গ্রন্থের মূল নিবন্ধে এর নাম 'চাকরি, কাজকর্ম ও ব্যবসা : উদ্যম, চেষ্টা, পরিশ্রম।' উদ্যম ও পরিশ্রম নিবন্ধে লুৎফর রহমান স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করেছেন যে, জীবনধারণের জন্য কাজ করতে হবে। তবে কোনো কাজই যেন মনের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে। চাকরি জীবনে স্বার্থবুদ্ধি বা অন্যায়ের কোনো স্পর্শ যেন না থাকে। কাজ ছোট হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে যেন ব্যক্তি তার সত্তার অমর্যাদা না ঘটায়। পৃথিবীতে এমনও দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা এককালে ছোটখাটো কাজ করেছেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজ লক্ষ্য স্থির রেখে অবশেষে হয়েছেন পৃথিবীখ্যাত লোক। আত্মোন্নতির জন্য পরিশ্রম এবং উদ্যম অপরিহার্য, এর সঙ্গে উন্নত দৃষ্টি ও একাগ্র মনোযোগ থাকতে হবে। সত্তার মহিমা উদ্ভাসিত হয় কাজের মাধ্যমে, তেমনি সমাজেও স্বনির্ভর যুবকের, শিক্ষিত মানুষের অফুরন্ত শক্তির প্রকাশও আমরা দেখতে পাই। প্রবন্ধটির মূল শিক্ষা এই যে, উদ্যম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করা যায়; অন্যের অনুগ্রহ নয়, বরং নিজের পরিশ্রম ও কাজের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের প্রকৃত সফলতা।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পাঁচটি জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ কর।

২. তোমার এলাকায় তুমি কী কী সমাজসেবামূলক কাজ করতে পার তার তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'উদ্যম ও পরিশ্রম' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত?

ক. উচ্চ জীবন খ. মহৎ জীবন
গ. উন্নত জীবন ঘ. মানব জীবন

২। 'সময়ের যারা সদ্ব্যবহার করে তারা জিতবেই'– একথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পরিশ্রমীরা বিজয়ী হবে খ. আলস্য ত্যাগ করা উচিত
গ. কাজকে ঘৃণা করা অনুচিত ঘ. সৎশ্রমের কোনো বিকল্প নেই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

৩। 'উদ্যম ও পরিশ্রম' প্রবন্ধের যে চরিত্রের মাঝে উদ্দীপকের প্রতিফলন দেখা যায় তিনি হলেন –

i. আরভিং
ii. ড. জনসন
iii. প্লেটো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। **উদ্দীপকটিতে 'উদ্যম ও পরিশ্রম' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. সততা ও পরিশ্রম খ. উদ্যম ও পরিশ্রম
গ. উদ্যম ও সাহস ঘ. পরিশ্রম ও নিষ্ঠা

সৃজনশীল প্রশ্ন

শামীম পেশায় নৈশপ্রহরী। একদিন রাতে দেখে ম্যানেজার সাহেব শ্রমিকদের দিয়ে গুদামের মালামাল সরাচ্ছেন। এতে সে প্রতিবাদ করায় তাকে ম্যানেজার চাকরিচ্যুতির হুমকি দেয়। এ অন্যায় কাজকে সমর্থন করতে না পারায় সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যায়। সেখানে হাঁস-মুরগি, মৎস্য ও শবজির চাষ শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই তার ব্যবসায়ের বেশ প্রসার ঘটে। অনেক বেকার যুবককে নিয়োগ দেয় তার খামারের কাজে।

ক. কাকে ইউরোপের জ্ঞানগুরু বলা হয়?
খ. জুতা পেয়ে জনসন অপমান বোধ করলেন কেন?
গ. উদ্দীপকের শামীমের মাঝে 'উদ্যম ও পরিশ্রম' প্রবন্ধের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবটি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'উদ্যম ও পরিশ্রম' প্রবন্ধে বর্ণিত চেতনার সমগ্র অংশকে ধারণ করে কি?"—যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

জীবনে শিল্পের স্থান

এস. ওয়াজেদ আলি

[**লেখক-পরিচিতি:** হুগলি জেলার শ্রীরামপুরস্থ বড়তাজপুর গ্রামে ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এস. ওয়াজেদ আলি জন্মগ্রহণ করেন। শিলং-এর মোখার হাইস্কুল থেকে স্বর্ণপদকসহ এন্ট্রান্স পাশের পর তিনি আলীগড় কলেজ থেকে আই. এ. এবং ১৯১০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১৫ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সত্য ও সুন্দরের সাধনায়, নীতিজ্ঞান, ধর্মবোধ ও প্রেমের শাশ্বত মহিমায় মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন রসবোধে তাঁর সাহিত্যকর্ম সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ: জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩); গল্পগ্রন্থ: গুলদাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), ভ্রমণকাহিনী: মোটরযোগে রাঁচির সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত (১৩৫৫)। ১৯৫১ সালের ১০ই জুন তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।]

জীবনকে সুন্দর করতে হলে সৌন্দর্যের নিদর্শন শিল্পকে সাধারণ জীবনে বিশিষ্ট একটু স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের বাড়ি সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির প্রাঙ্গণ সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির আসবাবপত্র সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির বেষ্টনীও সুন্দর হওয়া চাই। তারপর আমরা যা পরি, আমরা যা ব্যবহার করি, সবই সুন্দর হওয়া চাই। কেবল তাই নয়– আমাদের বসবার ভঙ্গি সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের উঠবার ভঙ্গি সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের কথা বলবার ভঙ্গি সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি, আমাদের প্রত্যেকটি আচার, প্রত্যেকটি ব্যবহার সুন্দর হওয়া চাই। যা অসুন্দর, যা কদর্য, যা কুৎসিৎ, যা কদাকার সে সবকে কোন-না-কোন উপায়ে জীবন থেকে আমাদের তাড়াতে হবে। সত্য যেমন বাঞ্ছনীয় জীবনের অপরিহার্য একটি অঙ্গ, শ্রেয় যেমন বাঞ্ছনীয় জীবনের অপরিহার্য একটি অঙ্গ, সুন্দরও তেমনি সেই বাঞ্ছনীয় জীবনেরই অপরিহার্য একটি অঙ্গ। প্রাচীন গ্রিকেরা যে একান্তভাবে সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন পাঠক সে কথা জানেন। তাঁরা যুদ্ধ-কুশল এবং যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন। তাদের বিষয় আমি পড়েছি, যুদ্ধের সময় সর্বাঙ্গ লাল কাপড়ে আবৃত করে তাঁরা যুদ্ধে যেতেন, রক্তের দাগ দেহকে তাদের যাতে কুৎসিৎ, কদাকার করে না তোলে সেই উদ্দেশ্যে। আমাদেরও তাঁদেরই মতো জীবনকে সর্বপ্রকার কদর্যতা থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রামে এবং শহরে কি দৃশ্য আমরা দেখতে পাই? আমার নিজের এবং আশেপাশের গ্রামগুলির কথাই এখন বলি। মোটরযোগে কিংবা পদব্রজে District Board-এর রাস্তা বেয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হই, তখন স্পষ্টই মনে হয়, District Board-এর কর্তারা জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা মোটে উপলব্ধি করেন না! সরু, অসমান পথ, দুধারে তার আগাছার রাশ। পথের পাশ দিয়ে চলে গেছে নর্দমা, তাতে কতরকম আবর্জনা যে পড়ে আছে তা বর্ণনা করা যায় না। অদূরে বাঁশের বন, তাতে মানুষও প্রবেশ করতে পারে না, আলোকও প্রবেশ করতে পারে না। ডোবা, পুষ্করিণী, মজানদী সবই লতাগুল্মে ভরা– কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমরা দেশ নিয়ে

গর্ব করতে ভালোবাসি। বক্ষ স্ফীত করে সব সময়ে আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের মতো সুন্দর দেশ কোথাও নাই। কিন্তু সত্যই কি তাই!

এই সেদিন আমি শিমুলতলায় গিয়েছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমার সঙ্গে এক তরুণ বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি বড়োই ভালোবাসেন। শিমুলতলায় যাবার পূর্বে তাঁর কাছে বাংলা দেশের সৌন্দর্যের প্রশংসা অহরহ শুনতে পেতুম। ফেরবার সময় যখন আমাদের ট্রেন বাংলার মাটিতে প্রবেশ করলে তখন দেখলুম আমার তরুণ বন্ধু মাতৃভূমির সৌন্দর্যের বিষয়ে তাঁর মত সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলেছেন। সত্যই, বর্ধমান থেকে কলকাতায় আসতে যে কদর্যতা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যথায় জর্জরিত করে, তা দেখে মনে হয় না যে আমাদের দেশের লোকেরা জীবনের সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র উপলব্ধি করছেন।

আমার গ্রামের কথায় ফেরা যাক্। District Board-এর রাস্তা থেকে যে পথ গ্রামে গিয়েছে সে পথ এত সরু যে, তার উপর দিয়ে কোন রকম যানবাহন চালান একান্ত কঠিন ব্যাপার। সেই সরু রাস্তাকে গ্রামবাসীদের সৌন্দর্য অনুভূতিহীন স্বার্থপরতা নিত্যই আরও সরু করে তুলছে। সকলেই সাধারণের রাস্তার এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি কিংবা ততোধিক পরিমাণ জমি নিজের এলাকাভুক্ত করবার জন্য ব্যগ্র। রাস্তার সৌন্দর্যের দিকে কারও দৃষ্টি নাই, সৌন্দর্য নামক জিনিসটার দিকেই কারও দৃষ্টি নাই। গ্রামে অনেকগুলি কোঠাবাড়ি আছে। সে সব প্রস্তুত করতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির কোন নিদর্শন বাড়িগুলির ভিতরেও পাওয়া যায় না আর বাইরেও পাওয়া যায় না। এক কাঠা জমিও কেউ সুন্দরভাবে সাজাতে চেষ্টা করেনি। কেউ হয়তো কিছু ফার্নিচার, দু'একখানা ছবি একটা ঘরে রেখেছে। কিন্তু সে ঘরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, যে গৃহস্বামী Taste বা রুচি জিনিসটার সঙ্গে দূর সম্পর্কও রাখে না। মাটির বাড়ির অবস্থা কোঠাবাড়ির চেয়েও শোচনীয়,আর বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতির বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো।

পল্লিগ্রামের বিষয় যা বলা হলো, শহরের বেলাতেও তাই বলা চলে। শহরের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বাড়ির বেষ্টনী প্রভৃতি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমাদের দেশবাসীরা জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজন মোটেই অনুভব করেন না, সুন্দর কি আর অসুন্দর কি সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা একান্তই কুহেলিকাবৃত।

আমি এক স্থানে বলেছি, পুনরায় বলি, সবচেয়ে বড়ো শিল্প হচ্ছে জীবন-শিল্প। অন্য সব রকমের শিল্প হচ্ছে সেই বিরাট জীবন শিল্পেরই এক একটি বিভাগমাত্র। প্রত্যেকটি বিভাগের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার, জীবন-শিল্পকে সার্থক করার জন্যে। আর যদি সত্যই তা করতে হয়, তবে আমাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আমাদের নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এক কথায় আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর সেজন্য দরকার ব্যাপক এবং ঐকান্তিক সমবায়িক প্রচেষ্টা।

পাঠক বলবেন, এত বড়ো প্রচেষ্টার কথা বলা সহজ, করা সহজ নয়। ক্ষুদ্র আমি এতে কী করতে পারি? তবে বলি শুনুন। আপনি এতে অনেক কিছু করতে পারেন। আপনার বাড়িকে সুন্দর করে সাজান। আপনার বাড়ির উঠানকে, আশ-পাশের জমিকে পত্রেপুষ্পে শোভিত করে তুলুন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ আর্টের এক একটি নিদর্শন হোক। সুন্দর এক বেষ্টনী আপনার জীবনে ঘিরে থাকুক। সুন্দরের প্রশংসায় আপনার কণ্ঠ মুখরিত হোক। দেখবেন নিজেকে যতটা ক্ষুদ্র মনে করেছিলেন ততটা ক্ষুদ্র আপনি নন। আর দেখবেন, আপনার স্তব-স্তুতিতে, আপনার সাধনায় তুষ্ট হয়ে সৌন্দর্যদেবী আপনার গ্রামে, আপনার পাড়ায় সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : পদব্রজ – পায়ে হাঁটা। **নর্দমা** – পয়ঃপ্রণালি, ড্রেন। **মজানদী** – জলহীন নদী, শুকিয়ে যাওয়া নদী। **স্ফীত** – ফুলে বা ফেঁপে উঠেছে এমন, গর্বিত। **কোঠাবাড়ি** – পাকাবাড়ি, অট্টালিকা, দালান। **ফার্নিচার** – আসবাবপত্র। **কুহেলিকাবৃত** – কুয়াশা আবৃত, প্রচ্ছন্ন। **সমবায়িক** – সম্মিলিত উদ্যোগে কোনো কিছু গড়ে তোলার প্রয়াস, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা।

পাঠ-পরিচিতি : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলি থেকে, 'জীবনে শিল্পের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তবে মন না থাকলে মানুষ হয় না। আর এ মনকে সর্বদা মানস-সৌন্দর্যের চর্চায় নিবেদিত হতে হয়। কথাবার্তা, আচরণ, খাদ্য গ্রহণ, পোশাক নির্বাচন, গৃহসজ্জা, গৃহের চারপাশের পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি মানুষের জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে। এর ফলে পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার নিদর্শনরূপে গড়ে ওঠে। 'জীবনে শিল্পের স্থান' প্রবন্ধটিতে এস. ওয়াজেদ আলি জীবন ও সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। প্রবন্ধটি সৌন্দর্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হবার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

তোমার বাড়ির সৌন্দর্য বাড়াতে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবচেয়ে বড় শিল্প কোনটি?

ক. চারুশিল্প খ. জীবনশিল্প

গ. কারুশিল্প ঘ. স্থাপত্যশিল্প

২। জীবন-শিল্প বলতে কী বোঝায়?

ক. গৃহের চারপাশ সুন্দর রাখা

খ. মানস সৌন্দর্যের চর্চা করা

গ. সুন্দরকে আরও গভীরভাবে জানা

ঘ. চারপাশে শিল্পকলার প্রয়োগ ঘটানো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৃথিবীর সব ফুল একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এ নিয়মটি হলো একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারদিকে ছড়িয়ে থাকবে। এই এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে।

৩। উদ্দীপকে 'জীবনে শিল্পের স্থান' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো –

i. জীবন-সৌন্দর্য

ii. নিয়ন্ত্রিত জীবন

iii. সৃষ্টির প্রয়াস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না, তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন– নকশিকাঁথা, রাতে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী– সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুঁই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছেন গাঁয়ের বধূরা। নকশিকাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই জ্ঞানীরা বলেন, 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল আর– প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করল।'

ক. 'সমবায়িক' শব্দের অর্থ কী?

খ. আমাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে কেন?

গ. উদ্দীপকে 'জীবনে শিল্পের স্থান' প্রবন্ধে ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উল্লিখিত ফুটে ওঠা দিকটি 'জীবনে শিল্পের স্থান' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিফলন মাত্র" – মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

আম-আঁটির ভেঁপু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি:** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে ২৪ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বনগ্রাম স্কুল থেকে ১৯১৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. এবং বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি হুগলী, কলকাতা ও ব্যারাকপুরের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাপনের অসাধারণ এক আলেখ্য নির্মাণ করে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে তাঁর কথাসাহিত্য মহিমান্বিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিত*, *আরণ্যক*, *ইছামতি*, *দৃষ্টিপ্রদীপ*। *গল্পগ্রন্থ : মেঘমল্লার*, *মৌরীফুল*, *যাত্রাবদল*। ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোটো টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল্-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে- একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া তাহাকে একপাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁইয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কি না!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল–অপু– ও অপু–। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল- কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল– আয় এদিকে– শোন্–

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ– বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,– কে রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা! সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল– মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল– উঁহু–

দুর্গা চুপিচুপি বলিল – একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাবো –

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল – কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল-পটলিদের বাগানে সিঁদুরকৌটোর তলায় পড়ে ছিল – আন্ দিকি একটু নুন আর তেল!

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল – তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

– তুই যা না শিগগিরি করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি-ক্ষার কাচতে গিয়েচে শিগগির যা–

অপু বলিল– নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো– তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কি না।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল– তেলটেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে– তুই তো একটা হাবা ছেলে–

অপু বাড়ি মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,– বলিল, নে হাত পাত।

– তুই অতগুলো খাবি দিদি?

– অতগুলি বুঝি হলো? এই তো– ভারি বেশি– যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা– বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তা হলে–

– লঙ্কা কী করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাই নে?

– তবে থাকগে যাক্ – আবার ওবেলা আনবো এখন-পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে – দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে–

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুয্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেকদিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে– ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল- দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা–

দুর্গা বলিল– মা ডাকছে, যা দেখে আয়– ওখানা খেয়ে যা– মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্–

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল– মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে ...

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল– কী মা?

–কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি কুটোগাছটা ভেঙে দু খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন– সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে!

–রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু ... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল –আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুকে বড্ড লাগে!

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল– চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল– উঃ, চিবনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে–

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখটেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,– আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল– তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল– ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি– এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে– তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো–

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল– যা, বাছুরটা ধরগে যা– ডেকে সারা হোলো– কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা–

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা হাতার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল– লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল– আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে– আবার কোনোদিন আম দেবো খেও–ছাই দেবো–এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়– দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার– যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল– অপুকে দেখচি নে?

সর্বজয়া বলিল– অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

–দুগ্‌গা বুঝি–

–সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে– সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে– কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে– এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে– অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল– আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক,খুব মাতবর, পাঁচটা–ছয়টা গোলা বাড়িতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক– আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে–

দাদাঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম– না বাপু, আমি তো কৈ?– বল্লে- আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সবসময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি– তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি– আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু- এক-দিনে– বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেজেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল– হ্যাঁগো, তা মন্দ কী? দাও না ওদের মন্তর? কী জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল– বলো না কাউকে!– সদ্‌গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব–

–আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদ্‌গোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে– ঐ রায়বাড়ির আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়– আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকরুন বল্লে– বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিই নে– তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম– আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে। ছেলেটার কাপড় নেই– দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়– আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই–

–আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা– জমি দিয়ে বাস করাই– গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজি– পয়সার তো অভাব নেই! আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা– ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত–

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল– এখ্‌খুনি। তা তুমি রাজি হলে না কেন? বল্লেই হতো যে আচ্ছা আমরা আসবো! ও রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়- এ গাঁয়ে তোমার আছে কী? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা–

হরিহর হাসিয়া বলিল– পাগল! তখুনি কি রাজি হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে– উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়– তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে– আর এখন ওঠ বল্লেই কী ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না– দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়–

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ওধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কী কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ি ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুকনো রড়া ফলের বিচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক-দুই-তিন-চার ... ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বিচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল – অপুকে এইগুলো দেবো – আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো–

কেমন বিচিগুলি তেল চুকচুক কচ্ছে– আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গোরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙি গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হলো।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বিচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : রোয়াক – ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। **চুপড়ি** – ছোটো ঝুড়ি, ক্ষুদ্র ধামা। **নাটাফল** – করঞ্জা ফল। **খাপরার কুচি** – কলসি-হাঁড়ি প্রভৃতির ভাঙা অংশ বা টুকরা। **পিজরাপোলের আসামি** – খাঁচায় পড়ে থাকা অবহেলিত আসামির মতো অর্থে। **দাওয়া** – বারান্দা। **আমের কুসি** – কচি আম। **জারা** – জীর্ণ করা, কুচি কুচি করা অর্থে। **বন-বিছুটি** – এক প্রকার বুনো গাছ।

কালমেঘ – যকৃতের রোগে উপকারী একপ্রকার তিক্ত স্বাদের গাছ। **গরাদ**– জানালার শিক। **ভেরেণ্ডাকচার বেড়া**–এরন্ড বা রেড়ি গাছের বেড়া। **কুটোগাছ**– তৃণ। **রোসো রোসো** – থাম থাম।

পাঠ-পরিচিতি: 'আমআঁটির ভেঁপু' শীর্ষক রচনাটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের অংশ বিশেষ গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান নিয়ে কাহিনিটি রচিত হয়েছে। অপু ও দুর্গা হতদরিদ্র পরিবারের শিশু। কিন্তু তাদের শৈশবে দারিদ্র্যের সেই কষ্ট প্রধান হয়ে ওঠেনি। গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল মানুষের চিরায়ত শৈশবকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বজয়া পল্লি–মায়ের শাশ্বত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এখানে শিশুর আনন্দপূর্ণ শৈশব এবং প্রকৃতির সম্পর্ক দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। রচনাটি শিশু-কিশোরকে প্রকৃতিমুখী হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. 'আমআঁটির ভেঁপু' রচনায় যে সকল গ্রামীণ উপাদান ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
২. তোমার পঠিত 'আম-আঁটির ভেঁপু' অনুরূপ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা সংবলিত অন্য একটি গল্পের আলোচনা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উঠানের কোন জায়গা থেকে দুর্গা অপুকে ডাকছিল?

ক. আমতলা খ. বটতলা
গ. কাঁঠালতলা ঘ. জামতলা

২। তেলের ভাঁড় ছুঁলে দুর্গাকে মারার কারণ হচ্ছে–

i কুসংস্কার
ii অপচয়
iii না জানানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন ও রুমা দুই ভাই-বোন। তাদের বয়সের পার্থক্য চার বছর। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন জিনিস একে অন্যকে তারা দেখাতে চায় না। রুমার খেলার সামগ্রী রিপন লুকিয়ে রাখে। রুমার বিভিন্ন আদেশ, আবদার রিপন মানতে চায় না। এই নিয়ে ওদের মাকে নানা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়।

৩। উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিককে প্রতিফলিত করেছে?

ক. ভাই-বোনের সম্পর্ক খ. ভাই-বোনের বিরোধ
গ. ভাই-বোনের আবদার ঘ. মায়ের চিন্তা

৪। উদ্দীপকের ভাবনা 'আম-আঁটির ভেঁপুর' কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. নারকেলের মালাটা আমায় দে।
খ. তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত।
গ. দুর্গার হাতে একটি নারিকেলের মালা।
ঘ. একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাবো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

একই পরিবারের মকবুল, আবুল, সুরত সবাই বেশ পরিশ্রমী। নিজেদের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গাচাষ করে, লাকড়ি কাটে, মাঝিগিরি করে, কখনো কখনো অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের স্ত্রীরাও বসে নেই। ভাগ্যের উন্নতির জন্য পাতা দিয়ে পাটি বোনে, বাড়ির আঙিনায় মরিচ, লাউ, কুমড়া ফলায়, বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করে। কোনো রকমে জীবন চলে যাচ্ছে তাদের।

ক. দুর্গার বয়স কত?

খ. বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপুর' কোন দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলভাবকে কতটুকু ধারণ করে?"–যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

[**লেখক-পরিচিতি :** মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ সালে (২৯শে ভাদ্র ১৩০৩ সাল) সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এখানেই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান। এরপর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি *মাসিক মোহাম্মাদী*, *দৈনিক মোহাম্মাদী*, *দৈনিক সেবক*, *সাপ্তাহিক সওগাত*, ইংরেজি *দি মুসলমান* ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মহামানুষ মুহসীন*, *মরুভাস্কর*, *সৈয়দ আহমদ*, *স্মার্ণানন্দিনী*, *ছোটদের হযরত মুহম্মদ* ইত্যাদি। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা ছেড়ে বাঁশদহে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।]

হজরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হজরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।

মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হজরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাহারা হজরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী: মুহম্মদ (স.) একজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন; তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হজরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলেরই চৈতন্য হইল। হজরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হজরতের বাণী : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি অমর সাক্ষ্য : মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হজরত আবুবকর (রা.) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ– এই কথাই বৃদ্ধ হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হজরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই।

জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল-আমিন– বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হজরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হিজরতের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হজরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হজরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নব অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্তশ্রী। তাঁহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন, কাজল-রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল, তাঁহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের ঢলঢল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তাঁহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে। বড়ো সুন্দর, বড়ো মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

সত্যই হজরত বড়ো সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে;–এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

তায়েফে সত্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কী ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উপহাসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন : না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে

দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়ত কাল তাহারা-তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি ঊর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন : তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও। বিপদবারণ তুমি অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা– তাঁহাদের পংক্তিতে আমার স্থান দাও।

মক্কাবাসীরা হজরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কী নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল, কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হজরত মদিনায় চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হজরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র শত শত ঘাতক পাঠানো হইল। বদর, ওহোদ ও আহজাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের যুদ্ধে হজরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হজরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হুদায়বিয়া সন্ধিতে হজরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হজরত যেই দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বাণ, হজরত তাঁহাদের সহিত কী ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হজরতের বিরাট মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণায় নয়, মানুষ হিসেবে আপনার তুচ্ছতাবোধ আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমাগৌরবকে মুহূর্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কাবিজয়ের পর হজরত সাফা পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হজরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হজরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটির অধীন, হজরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ত্রুটি হইতে পারে– এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করিয়াছেন।

একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ। সম্ভবত সে হজরতের দুইএকটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হজরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হজরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হজরত বড়ো আদর করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

মানুষ হিসেবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হজরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছা-স্বীকৃত দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড়ো অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হজরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকলের সঙ্গী সহচররূপে সহোদর ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবি মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লান বদনে সহিলেন। হায়, সেই দয়ার নবি, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাট রুধিরাক্ত হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন। দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবি আজ চলিয়া গেলেন। বিবি আয়েশার মর্মছেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের, সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু ঊর্ধ্ব লোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন

চরিত্র-সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির পৃথিবীতে বড়ো সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : বীরবাহু–শক্তিধারী। **স্থিতধী**–স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। **ধী**–বুদ্ধি। **রাসুল**–আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **পরহিতব্রতী**–পরের উপকারে নিয়োজিত। **বয়ান**– মুখের বাণী। **গ্রীবা**–ঘাড়। **অকুতোভয়**-নির্ভয়। **নির্যাতন**–অত্যাচার, জুলুম। **কুসুমকোমল**–ফুলের মতো নরম। **লোষ্ট্রাঘাত**–ঢিলের আঘাত। **বৈরী**–শত্রু। **অরাতি**–শত্রু। **পৌত্তলিক**-মূর্তিপূজক। **তিতিয়া**–ভিজে। **সমাচ্ছন্ন**–অভিভূত। **পূর্ণোদর**–ভরপেট। **বীরবাহু ওমর**–ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন তেজস্বী বীরযোদ্ধা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোরেশ বংশোদ্ভূত তরুণ বীর ওমর মহানবিকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভগ্নীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হজরত ওমর (রা) ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহানবির বিশ্বাসভাজন সাহাবি।

রুধিরাক্ত– রক্তাক্ত, রক্তরঞ্জিত। **রাহী**–পথিক, মুসাফির। **পুলকদীপ্তি**–আনন্দের উদ্ভাস। **অনুরুদ্ধ**–অনুরোধ করা হয়েছে এমন।

মহামতি আবুবকর–ইসলামের প্রথম খলিফা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম পুরুষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মহানবির হিজরতকালীন সঙ্গী এবং সারাজীবনের বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

মক্কা–সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান নগরী। এখানে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ অবস্থিত। এই নগরীতে রাসুলুল্লাহ (স.) জন্মগ্রহণ করেন।

মদিনা– সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত নগরী। এখানে হজরত মুহম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর মাজার রয়েছে।

হিজরত– শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ। এখানে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা বোঝানো হয়েছে। এই সময় থেকে হিজরি সাল গণনার শুরু।

তায়েফ– সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ।

বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর– হজরতের জীবনকালে ভিন্ন ধর্মাবলম্বলীদের বিরুদ্ধে এ সব স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল।

হুদায়বিয়া– একটি যুদ্ধক্ষেত্র, এই স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) এর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসুলুল্লাহর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

খালিদ– হজরতের জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীরযোদ্ধা এবং সেনাপতি।

সাফা– সাফা ও মারওয়া দুটি ছোটো পাহাড় কাবার নিকটে অবস্থিত। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে আজও হজ্জব্রতীরা সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে থাকেন।

আয়েশা (রা.)– হজরত আবুবকরের কন্যা, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অন্যতম সহধর্মিণী, বিদুষী রমণী ছিলেন। হযরতের ইন্তেকালের পর তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করেন।

পাঠ-পরিচিতি : 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত *মরু ভাস্কর* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবিক গুণাবলি এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হযরত ছিলেন মানুষের নবি। তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেই একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে গেছেন। ক্ষমতা ও মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান। তাঁর সমগ্র জীবন মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে তিনি তাঁর জীবন রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর সাধনা, ত্যাগ, কল্যাণচিন্তা ছিল বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য অনুকরণীয়। হজরত মুহম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে যে বেদনা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল তা প্রশমন করার জন্য হজরত আবুবকর (রা) মহানবি (স.)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রচণ্ড শোককে শান্ত করেন। হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবিক গুণাবলি উপস্থাপনের মাধ্যমে এ প্রবন্ধ আমাদের নৈতিক, সৎ ও মানবিক হবার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হজরত মুহম্মদ (স.) কাদের কাছে উপহাসিত হয়েছিলেন?

ক. ইহুদিদের খ. খয়বরবাসীদের
গ. পৌত্তলিকদের ঘ. হুদায়বিয়াবাসীদের

২। 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'– এ উক্তিতে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সহনশীলতা খ. উদারতা
গ. মহানুভবতা ঘ. বিচক্ষণতা

৩। 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমনই এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাহার নিত্যকার আহার্য।' এ বক্তব্যে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের ফুটে ওঠা দিকটি হলো–

i. নিরহংকার
ii. বিচক্ষণতা
iii. সত্যনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪। **উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?**

ক. একটিমাত্র পিরান কাচিয়া শুকায় নি তাহা বলে
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা তলে।
খ. তুমি নির্ভীক এক খোদা ছাড়া করোনিকো কারে ভয়
সত্যব্রত তোমায় তাইতো সবে উদ্ধত কয়।
গ. উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।
ঘ. বায়তুল মাল হইতে লইয়া ঘৃত-আটা নিজ হাতে
বলিলে, এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

হজরত নূহ (আ) ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এতে মাত্র চল্লিশ জন মানুষ সাড়া দেন। বাকিরা সবাই তাঁর বিরোধিতা শুরু করে নানা অত্যাচারে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এ অত্যাচারের মাত্রা সহনাতীত হলে তিনি একপর্যায়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। আল্লাহর হুকুমে তখন এমন বন্যা হয় যে, ঐ চল্লিশ জন বাদে সকল অত্যাচারী ধ্বংস হয়ে যায়।

ক. হজরত মুহম্মদ (স.) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
খ. সুমহান প্রতিশোধ বলতে কী বোঝায়?
গ. হজরত নূহ (আ) যেদিক দিয়ে হজরত মুহম্মদ (স.) থেকে ভিন্ন তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হজরত নূহ (আ)-এর চরিত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর একটি বিশেষ গুণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নিমগাছ

বনফুল

[**লেখক-পরিচিতি :** প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বিহারের পূর্ণিয়ার অন্তর্গত মণিহার গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বনফুল পূর্ণিয়ার সাহেবগঞ্জ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই.এসসি এবং পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ করেন। মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরির মাধ্যমে বনফুলের কর্মজীবন শুরু। ১৯১৮ সালে *শনিবারের চিঠি*'তে ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারোডি লিখে তাঁর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ। *প্রবাসী* পত্রিকায় তিনি একপাতা-আধপাতার গল্প লিখতেন। গল্পগুলো আকারে ক্ষুদ্র, অথচ বক্তব্যে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ : *বনফুলের গল্প*, *বনফুলের আরো গল্প*, *বাহুল্য*, *বিন্দুবিসর্গ* ইত্যাদি। বাস্তবজীবনে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদান তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বনফুলের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : *তৃণখণ্ড*, *কিছুক্ষণ*, *দ্বৈরথ*, *জঙ্গম* ইত্যাদি। বিভিন্ন পুরস্কারসহ তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বনফুল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।]

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!

কেউবা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই ...

কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ... দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলে– 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।'

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ– সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,– 'বাহ্, কী সুন্দর পাতাগুলি ... কী রূপ ! থোকা–থোকা ফুলেরই বা কী বাহার... একঝাঁক

নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ্–'

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এক দশা। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : ছাল – বাকল, এখানে নিমগাছের বাকল। **শিলে পেষা** – শিল-পাটায় বাটা। **অব্যর্থ** – যা বিফল হবে না। **পাতাগুলো খায়ও** – নিমের কচিপাতা খেলে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। **শান দিয়ে বাঁধানো** – এখানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বোঝাচ্ছে। **কবিরাজ** – যিনি গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন। **কবি** – যিনি কবিতা লেখেন। **শিকড় অনেক দূর চলে গেছে** – প্রতীকাশ্রয়ে বর্ণিত। নিমগাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং চারিদিকে বিস্তৃতও হয়। লক্ষ্মী বউটার প্রতীক যেহেতু নিমগাছ সেহেতু নিমগাছের শিকড়ের সঙ্গে বউয়ের সংসারের জালে চারিদিকে আবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) *অদৃশ্যলোক* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নিমগাছ' গল্প। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে লেখক বিপুল বক্তব্য উপস্থাপনে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। নিমগাছের বর্ণনা, এর পাতা, বাকল, ছায়া ইত্যাদির বাহ্যিক উপকারিতা কবিতার মতো বর্ণনা করা হয়েছে এই গল্পে। কবিরাজ তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কেউ এই গাছের সামান্যও যত্ন নেয় না। একজন কবি একদিন নিমগাছের গুণ ও রূপের প্রশংসা করে। নিমগাছের ভালো লাগে ঐ লোককে এবং সে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়। কিন্তু মাটির গভীরে তার শিকড়। গাছটি যেতে পারে না। আসলে গাছ তো চলতে পারে না। এটি একটি প্রতীকী গল্প। প্রকৃতপক্ষে, 'নিমগাছ' গল্পটির নিমগাছ প্রতীকের সূত্রে বনফুল দেখিয়েছেন নারীর অপরিসীম আত্মত্যাগ। নারীর মানবিক মর্যাদা, পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ইঙ্গিত দেয় গল্পটি।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। নিমগাছের গুণাগুণের একটি তালিকা তৈরি কর।

২। তোমার এলাকায় নিমগাছ রোপণের কর্মসূচি নেওয়া দরকার। এ কাজ করার জন্য তোমরা কী কী করবে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিমগাছের ছাল নিয়ে লোকজন কী কাজে লাগায়?

ক. সিদ্ধ করে খায় খ. ভিজিয়ে খায়
গ. শুকিয়ে খায় ঘ. রান্না করে খায়

২। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হয় কেন?

ক. এটা দেখতে সুন্দর খ. এটা উপকারী
গ. এটা পরিবেশ-বান্ধব ঘ. এটা আকারে ছোট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

গফুরের প্রিয় ষাঁড় মহেশ। প্রায় আট বছর প্রতিপালন করছে গফুর সাধ্যমতো তার যত্ন নেয়। পরিবারের কেউ মহেশকে চায় না। কিন্তু গফুর সন্তানস্নেহে তাকে লালন করে। নিজের খাবার না খেয়ে মহেশকে খাওয়ায়, ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে মহেশকে খেতে দেয়।

৩। উদ্দীপকের মহেশ-এর সঙ্গে যেদিক দিয়ে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের সাদৃশ্য করা যায় –

i. অবদানে
ii. প্রয়োজনীয়তায়
iii. পরোপকারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিমদের বাড়িতে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ কাজ করছে আকলিমা খাতুন। এক কথায় সে তাদের সংসারটা শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে তা নয় বরং তাদের সমৃদ্ধির মূলে তার অবদান সীমাহীন। বয়সের ভারে আজ সে অক্ষম হয়ে বিদায় নিতে চায়। কেননা তার পক্ষে এখন আর গতর খাটানো অসম্ভব। তার এ প্রস্তাবে রহিম বলে, 'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। জীবনের বাকি সময়টুকু আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে কাটাবেন।'

ক. চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ কোনটি?

খ. নিমগাছটি না কাটলেও কেউ তার যত্ন করে না কেন?

গ. উদ্দীপকের আকলিমার সাথে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের সমগ্রভাবকে নয় বরং বিশেষ একটা দিককে তুলে ধরে"– যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন

কাজী নজরুল ইসলাম

[**লেখক-পরিচিতি :** কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সালে (২৪শে মে ১৮৯৯) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিন্ধুহিন্দোল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা* ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। *যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী* তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে (বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।]

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

– রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নতুন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না– যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটোলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত 'ছোটোলোক'-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এই 'ছোটোলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোটো মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও–যে আমাদেরই মতো মানুষ– সেও যে সেই এক আল্লাহ্‌–এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,– তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে– আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত

হইতে পারিতেছে না। হইবে কীরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমরা ভদ্রসম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি ভারতে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? তাঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,– সে-আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,–সে যে ডাকার মতো ডাকা,–তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্র বাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো– দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি,– ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটোলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ বোধন-বাঁশিতে সুর দিই–

'কীসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ!' ❑

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা : চণ্ডাল– চাড়াল, হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্গের লোক। **বোধন-বাঁশি**– বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি। **দৈন্য**– দারিদ্র্য, দীনতা।

পাঠ-পরিচিতি : 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলি* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) থেকে সংকলন করা হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এটি কাজী নজরুল ইসলামের *যুগবাণী* নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থের একটি রচনা। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। একটি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। বিশ্বের বুকে মর্যাদাবান জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করতে প্রতিটি দেশের মনীষীগণ আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথে যদি আমরা পরিভ্রমণ করতে পারি, তবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। প্রবন্ধটিতে জাতি, ধর্ম, সমাজভেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এ প্রবন্ধ শ্রেণি, ধর্ম, জাতি ও সমাজভেদমুক্ত বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কী কী করা উচিত, তা লিখ।

২। বাংলাদেশে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার প্রস্তাবনাগুলো লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আজ আমাদের মহাজাগরণের দিনে কত আনা শক্তি উপেক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করছে?

ক. ছয় আনা খ. আট আনা
গ. দশ আনা ঘ. বারো আনা

২। আজ আমাদের এত অধঃপতনের কারণ কী?

ক. মেহনতি মানুষদের প্রতি অবহেলা খ. গণজাগরণের অভাব
গ. স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ঘ. ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।'

৩। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের কোন মানসিকতার পরিচয় উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. অসাম্প্রদায়িকতার খ. সত্যবাদিতার
গ. ভ্রাতৃত্ববোধের ঘ. সাম্যবাদিতার

সৃজনশীল প্রশ্ন

'তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!'

ক. ব্যক্তির সমষ্টিকে এক কথায় কী বলা যায়?
খ. আমাদের দেশে জনশক্তি গঠন হতে পারছে না কেন?
গ. উদ্দীপকের 'মজুর, মুটে ও কুলি' 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের কাদের সমার্থক? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

[**লেখক-পরিচিতি:** মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় মননশীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ সংস্কৃতি কথা বাংলা সাহিত্যের মননশীল প্রবন্ধ-ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। *সভ্যতা* ও *সুখ* তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ। ১৯৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।]

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে: ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়। শিক্ষার এ দিকটা যে বড়ো হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়– একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দুএকটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্য সত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড়ো লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা।এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড়ো করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়– কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্ন-বস্ত্রের সমাধান সহজেই হতে পারে। কেননা অন্ন-বস্ত্রের অব্যবস্থার মূলে লোভ, আর শিক্ষাদীক্ষার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে,'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোটো জিনিসের মোহে বড়ো জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : **নিগড়**-শিকল, বেড়ি। **তিমির**–অন্ধকার। **ক্ষুৎপিপাসা**-ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। **ফতুর**–নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। **লেফাফাদুরস্তি**– বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে ফাঁপা। **বেড়ি** –শিকল, শৃঙ্খল। **হামেশা**- সবসময়, সর্বক্ষণ। **উন্মোচন**-উন্মুক্ত করা। **পিঞ্জরবদ্ধ**–খাঁচায় বন্দি। **জীবসত্তা**– জীবের অস্তিত্ব।

মানবসত্তা-মানুষের অস্তিত্ব। মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। **অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি**– লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়।

কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?– খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

পাঠ-পরিচিতি : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর *সংস্কৃতি-কথা* গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা– একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞান ও অন্তরের মুক্তি ব্যক্তিকে মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

মানব মুক্তির জন্য সমাজের উপরের অংশ ও নিচের অংশের কর্তব্যগুলো নির্দেশ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কোন দিকে লক্ষ রেখে?

ক. অর্থনৈতিক মুক্তির খ. আত্মিক মুক্তির
গ. চিন্তার স্বাধীনতা ঘ. বুদ্ধির স্বাধীনতা

২। আত্মিক মৃত্যু বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

i. স্বাভাবিক মৃত্যু
ii. নৈতিক অধঃপতন
iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুকুর মিয়া তার স্কুল-পড়ুয়া ছেলেকে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন টাকাই জীবনের মূল। দুনিয়াতে যার যত টাকা সে তত বেশি সুখী।

৩। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের শুকুর মিয়ার মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে–

i. ক্ষুৎপিপাসা
ii. আত্মার অমৃত
iii. অর্থলিপ্সা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪। শুকুর মিয়ার মানসিকতা পরিবর্তন হতে পারে যদি তিনি–

ক. অর্থলিপ্সাকে জীবন-সাধনা মনে না করেন।
খ. শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে গুরুত্ব দেন।
গ. অর্থচিন্তার নিগড়ে সর্বদা বন্দি থাকেন।
ঘ. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তিকে বড় করে না দেখেন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমন ও কবির বাল্যবন্ধু। দুজনই উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত। পেশাগত জীবনে সুমন বড় ব্যবসায়ী। গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি কোনো কিছুরই অভাব নেই তার। সবাই তাকে এক নামে চেনে। আর কবির শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। গত সিডরে তাদের গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এ সময় কবির তার ছাত্রদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। অথচ সুমন ছুটে এসে সাহায্যের বদলে অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিঘার পর বিঘা জমি কিনে নেয়।

ক. মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন?
খ. আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন?
গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "কবিরের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত" – 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

প্রবাস বন্ধু

সৈয়দ মুজতবা আলী

[**লেখক-পরিচিতি:** সৈয়দ মুজতবা আলী ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে আসামভুক্ত শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট গভর্মেন্ট হাইস্কুল ও শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন। পরে ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। আফগানিস্তানে কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মিশরের আল আজাহার বিশ্ববিদ্যা-লয়ে ও মহীশূরের বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়। পরে তিনি বিশ্বভারতীর রিডার নিযুক্ত হন। সৈয়দ মুজতবা আলী নিজস্ব এক গদ্যশৈলীর নির্মাতা। বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও অসাধারণ পান্ডিত্যের সংমিশ্রণে তিনি যে গদ্য রচনা করেছেন, তা খুবই রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো: *দেশে-বিদেশে*, *পঞ্চতন্ত্র*, *চাচা কাহিনী*, *ময়ূরকণ্ঠী*, *শবনম* ইত্যাদি। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসি। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে– জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফুন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজি'।

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো-না-কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম ছ ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। আঙুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হলো, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমির আবদুর রহমান হত তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্তানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ– হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক–কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হলো না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রং ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে– কিন্তু কার এমন বুকেট পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াসকিট।

ঠোঁট দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড়ো একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্তানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হলো। এ লোকটা ভীমসেনের মতো রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মতো আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে?

রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হলো খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কী কী রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কোরমা, কাবাব, ফালুদা–।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরি করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড়ো বড়ো গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরে রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা– মৃদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল– একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজনবোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।'

খুব বেশি দূর যেতে হলো না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মশিয়ে জিরার টাঙা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বসকে খুশি করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি', বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলন্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাৎ হয়েছিল: শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে ছুট করে বেরিয়ে গেল।

তখনরোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে কিছুদিন ধুলে আমার মুখও আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান এককালে মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলাভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস– তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাঙক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী-কাবাব। বারকোশ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার ওপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গি-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভয়বাণী দিল– রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেশন করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কী করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার ওপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারি কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান– ।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে– পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কি?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরফি আঙুর– তামাম আফগানিস্তানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণ এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে–মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজি নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলয়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রক্ষরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলি তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলি সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রং দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম, তৃতীয়, চতুর্থ– কাবুলিরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখো দিকিনি– তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরুবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়– আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কী করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর কখনো পানশির গিয়েছেন?'

'সে আবার কোথায়?'

'উত্তর-আফগানিস্তান। আমার দেশ– সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজি ঘোড়ার সঙ্গে বাজি রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের ওপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার ওপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানালার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে পড়ছে, পড়ছে– দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ– কী রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানালার কাছে বসে থাকব?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণভাবে তাকালো যে, মনে হলো এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানালার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুরঘট্টি ঘন,– চাদরের মতো নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,– প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি লাগায়– হু হু করে কখনো একমুখে হয়ে তাজি ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ-ওঁ-ওঁ– তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের ইঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ হাত উঁচু বরফের কম্বল– গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মতো ওম দেয়। তার তলায় মানুষকে দু দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে– সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই,

বালু নেই, ময়লা নেই ছুরির মতো ধারাল ঠান্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে– দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে– এক একবার দম ফেলাতে একশটা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন, তবে আমি আমার গোঁফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড়ো খুশি বাৎ হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশির জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানালার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?' ❑

শব্দার্থ ও টীকা : **ও রভোয়া** – ফরাসি ভাষার বাক্যবন্ধ। অর্থ : আবার দেখা হবে। **নরদানব** – মানুষের মতো দেখতে ভয়ঙ্কর জন্তু। এখানে বিশালদেহী মানুষ বোঝানো হয়েছে। আদরার্থে। **মর্তমান কলা** – মায়ানমারের মার্তাবান দ্বীপে উৎপন্ন কলার জাত। **রুজ** – গাল রাঙানোর প্রসাধনী। **পান্তুয়া** – চিনির রসে ভেজানো ঘিয়ে ভাজা রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টি। **তাগদ** – শক্তি। **তম্বী** – তিরস্কার। **বারকোশ** – কাঠের তৈরি কানা উঁচু বড় থালা। **পুনরপি** – পুনরায়। **ব্রহ্মরন্ধ্র** – তালুর কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র। **বপু** – বড় দেহ। **তনু** – ক্ষীণ দেহ। উত্তমার্ধ – স্ত্রী, সহধর্মিণী।

পাঠ-পরিচিতি : 'প্রবাস বন্ধু' সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে* গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ভূমি, পরিবেশ, সেখানকার মানুষ ও তাদের সহজ-সরল জীবনাচরণ, বিচিত্র খাদ্য ইত্যাদি হাস্যরসাত্মকভাবে এই রচনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখকের আফগানিস্তান বাসের আংশিক অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে এখানে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সন্নিকটে খাজামোল্লা নামক গ্রামে বাসের সময় আবদুর রহমান নামের একজন তাঁর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। আফগান আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে সরলতা, স্বদেশপ্রেম, অতিথিপরায়ণতা ফুটে উঠেছে। আবদুর রহমানের রান্না ও পরিবেশন করা খাবারের মধ্যে আফগানিস্তানের বিচিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের প্রস্তরভূমি এবং বরফ-শীতল জলবায়ু আকর্ষণীয়। 'প্রবাস বন্ধু' গল্পটি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে; একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভাবতে শেখায়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার এলাকায় শীতকালে যে প্রাকৃতিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তার পরিচয় দাও।

২। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধাগুলো লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'তন্বী' শব্দের অর্থ কী?

ক. বড় দেহ   খ. ক্ষীণ দেহ
গ. তিরস্কার   ঘ. পুনরায়

২। আবদুর রহমানকে লেখক নরদানব বলেছেন কেন?

ক. আচরণের জন্য   খ. শারীরিক গঠনের জন্য
গ. বেশি রান্নার জন্য   ঘ. বেশি খাওয়ার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

শীতের ছুটিতে জেরিন সিলেটের জাফলং বেড়াতে যায়। সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়ি ঝরনা, নদী সবকিছু তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সার্বিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে বাবাকে বলে, 'এখানে আমাদের একটা বাড়ি বানিয়ে দেবে?'

৩। উদ্দীপকের জেরিনের সঙ্গে গল্পের লেখকের চাওয়া একসূত্রে বাঁধা নয়, কারণ লেখক পানশির যেতে চেয়েছিলেন–

ক. অবকাশ যাপনের জন্য   খ. বিনোদনের জন্য
গ. জীবন বাঁচাতে   ঘ. সৌন্দর্য উপভোগের জন্য

৪। উদ্দীপকের জাফলং-এর সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের পানশিরের বিপরীত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়–

i. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে
ii. ঋতু বৈচিত্র্যে
iii. জীবন যাত্রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র-পাহাড়

কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।

এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রানি সে-যে আমার জন্মভূমি।

ক. অধ্যক্ষ জিরার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

খ. 'প্রবাস বন্ধু' প্রবন্ধে আবদুর রহমানকে 'নরদানব' বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের চেতনার যে দিকটিকে ধরা পড়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "বিষয় বর্ণনায় সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে রয়েছে বিস্তর বৈপরীত্য"— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

মমতাদি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি :** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর অঞ্চলের মালবদিয়া গ্রাম এবং মায়ের বাড়ি একই অঞ্চলের গাঁওদিয়া গ্রাম। তিনি মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। তারপর গণিতে অনার্স নিয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে *অতসীমামী* নামক গল্প বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে লেখক হিসেবে তাঁর যত্রা শুরু হয়। এ সময় তিনি লেখা নিয়ে এতই মগ্ন থাকেন যে, অসাধারণ এই কৃতী ছাত্রের আর অনার্স পাস করা হয়নি। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন। এরপর তিনি লেখালেখিকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। *পদ্মা নদীর মাঝি ও পুতুল নাচের ইতিকথা* লিখে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। *জননী, চিহ্ন, সহরতলী, অহিংস, চতুষ্কোণ* প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস । ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর এই মহান লেখক মৃত্যুবরণ করেন।]

শীতের সকাল। রোদে বসে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে বসে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনার রান্নার জন্য লোক রাখবেন? আমি ছোটো ছেলে-মেয়েও রাখব।

নিঃসঙ্কোচ আবেদন। বোঝা গেল সঙ্কোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সঙ্কোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরনে সেলাই করা ময়লা শাড়ি, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষত-চিহ্ন-আন্দাজে পরা টিপের মতো।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনি?

চমকে তার মুখ লাল হলো। সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধহয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনি। আমায় রাখবেন? আমি রান্না ছাড়া ছোটো ছোটো কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর

একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চার মাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

পনের টাকা মাইনে ঠিক হলো। সে বোধহয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দুচোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন? রান্নাঘর দেখবে না? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখবো, বলে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল না, আমায় তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেল। ওকে আমার ভালো লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু, আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে মার কাছে গেলাম। একটু বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ়!

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে? ভাবিস না, তোকে খুব ভালোবাসবে। বার বার তোর দিকে এমন করে তাকাচ্ছিলো!

শুনে খুশি হলাম। রাঁধুনি পদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ করে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করল– অনর্থক প্রশ্ন করল না, নির্দেশের অভাবে কোনো কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এ বাড়িতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিখুঁত হলো তার কাজ।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুশি হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে সে যে আমায় খুব ভালোবাসবে তার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ণ। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার পাঁচ বার রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালোবাসল না। বরং রীতিমতো উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার করে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দু একটি দরকারি কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতোই ম্লানিমার ঐশ্বর্যে মহীয়সী কিন্তু ধরাছোঁয়ার অতীত শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্বিকার।

রাগ করে আমি স্কুলে চলে গেলাম। সে কি করে জানবে মাইনে করা রাঁধুনির দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ির ছোটোকর্তা ছটফট করেছে!

সপ্তাহখানেক নিজের নতুন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুনছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধহয় অসুখ হবে,আর খেয়ো না। কেমন?

ভর্ৎসনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম। এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসো জল খাবে।

বাড়ির সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্নাঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি–

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কি হলো বামুনদি?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলো না খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোট এক নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথম ভারি লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব কথোপকথন মনে করে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে একরকম জড়িয়েই ধরে ছিল, হাত সরিয়ে ধরা পড়া চোরের মতো হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল, দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন করে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে।

তখন বুঝিনি, আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,– যদি কেবল মুখ কালো করে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনের টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললে, ও ওইরকম। সারাদিন বকবক করে। বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।

বলে মা চলে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে ঝরে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়তো শুকনোই থাকত, সম্মানে, চোখের জল ফেলল! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধহয় তার সইল না।

তিন চার দিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হয়, আঙুলের দাগ। মাস্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙুলের দাগ কেন? কে চড় মেরেছে?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়া বলল, দূর! তারপর হেসে বলল, আমি নিজে মেরেছি! কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে—

মশা মারতে গালে চড়! বলে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদবুদফাটা বাস্পে কি দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নিচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলছো দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি না। কে মারবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হলো। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠার আনা আছে! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ওকথা ঘোষণা করে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপি চুপি বলল, কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দিলাম আমি?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারি নামাতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়ে একরাশি চুল মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বৈকি। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস করে ছোটো ছেলেকে শোনানো; কারও কাছে যা পাই না তুমি তা দেবে কেন? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড় রহস্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেয়নি! ভেবেচিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণী পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ করে দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হলো সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরি হলে তুমি কী করবে?

তুমি কী করতে বল? হরির লুট দেব? না তোমায় সন্দেশ খাওয়াব।

ধেৎ তা বলছি না। তোমার বরের চাকরি নেই বলে আমাদের বাড়ি কাজ করছ, তা তো চাকরি হলে করবে না?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে!

তোমার বরের চাকরি হয়েছে।

হয়েছে বলে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা স্বামীর চাকরি নেই বলে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরির জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার চাকরি হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরি হয়েছে?

সে স্বীকার করে বলল, হয়েছে। বেশি দিন নয়, ইংরাজি মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক করে দিতে পারছ না বলে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছ? তার কোনো দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এবেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরি হয়েছে, তবু?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরি, তাতে কুলবে না মা। আমায় ছাড়বেন না। আমার কাজ কি ভালো হচ্ছে না?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবে না মা। সেজন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কি হয় খোকা?

মিথ্যে বললে কি হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যে বললে?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশি পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি! কাঁদছ কেন?

তখন তার চাকরির এক মাস বোধহয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলা লেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছে নেই টের পেয়েও এক রকম জোর করেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দুটি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল! গলিটা আস্ত ইট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। দুদিকের বাড়ির চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না?

সাতাশ নম্বরের বাড়িটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যত ক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোটো একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নিচে ঘরের সংখ্যা বোধহয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যে ভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোটো ছোটো কুঠরির বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রনের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লার ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘরে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই শোবার ঘর করে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশি মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনি অবস্থান যে আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসা-যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিসই প্রায় এঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কম দামি শ্রীহীন জিনিস। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড়ো চৌকি, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকির তলে একটি চরকা আর ভাঙ্গা বেতের বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তরালে হয়তো আরও জিনিস আছে। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাংক– দুটিরই রং চটে গেছে, একটির তালা ভাঙা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনের ঠিক ঊর্ধ্বে কোনাকুনি টাঙ্গানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণের মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙ্গা টেবিল, আগাগোড়া দড়ির ব্যান্ডেজের জোরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই-খাতা, একটি অল্প দামি টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আর্সি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিস। টেবিলের ঊর্ধ্বে দেওয়ালের গর্তের তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে আর একটি জিনিস ছিল– একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকিতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিল, তারপর গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিশ টেনে বার করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথার তলে বালিশ দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি তো রাগ করে– কই, তুমি লেবু খেলে না?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ করে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেব না, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম!

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল, কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মতো ভালোবাসত!

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, পানি তুলল, তারপর মশলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ি যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : **বাছা**– বৎস বা অল্পবয়সী সন্তান। **পর্দা ঠেলে উপার্জন**– এখানে নারীদের অন্তঃপুরে থাকার প্রথাভঙ্গ করে বাইরে এসে আয়-রোজগার করা বোঝাচ্ছে। **অনাড়ম্বর**– জাঁকজমকহীন। **বামুনদি**– ব্রাহ্মণদিদির সংক্ষিপ্ত রূপ। আগে রান্না বা গৃহকর্মে যে ব্রাহ্মণকন্যাগণ নিয়োজিত হতেন তাদের কথ্যরীতিতে বামুনদি ডাকা হতো। **অপ্রতিভ**– অপ্রস্তুত। **পরদিন থেকে সে আর আসত না**– না আসার কারণ আত্মসম্মান। মমতাদি টাকার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সত্য কিন্তু তাকে অসম্মান করলে বা সন্দেহের চোখে দেখলে নিজে অপমান বোধ করে চাকরি ত্যাগের সাহস তার ছিল। **হরির লুট**– ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দান করা। সংকীর্তনের পর হরির নামে যেভাবে বাতাসা ছড়ানো হয়।

পাঠ-পরিচিতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সরীসৃপ* (১৯৩৯) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *'মমতাদি'* গল্প। এই গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্কুল পড়ুয়া একটি ছেলে যখন দেখে তাদের বাড়িতে মমতাদি নামে এক গৃহকর্মী আসে, তখন সে আনন্দিত হয়। তাকে নিজের বাড়ির একজন বলে ভাবতে শুরু করে ছেলেটি। মমতাদির সংসারে অভাব আছে বলেই মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের নারী হয়েও তাকে অপরের বাড়িতে কাজ নিতে হয়। এই আত্মমর্যাদাবোধ তার সবসময়ই সমুন্নত ছিল। সে নিজে যেমন আদর ও সম্মানপ্রত্যাশী, তেমনি অন্যকেও স্নেহ ও ভালোবাসা দেবার ক্ষেত্রে তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না। স্কুলপড়ুয়া ছেলেটি তাই মমতাদির কাছে ছোটো ভাইয়ের মর্যাদা লাভ করে। তাকে নিজ বাসায় নিয়ে গিয়ে যথাসামর্থ্য আপ্যায়ন করে মমতাদি। সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে মমতাদির পাশেও দাঁড়ায় স্কুলপড়ুয়া ঐ ছেলে ও তার পরিবার। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের গৃহকর্মে যাঁরা সহায়তা করে থাকেন তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি। আত্মসম্মানবোধ তাদেরও আছে। *'মমতাদি'* গল্পটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, সামাজিক শ্রেণি মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না; যে কোনো পেশার যে কোনো মানুষকে দেখতে হবে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার দৃষ্টিতে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

স্নেহ-ভালোবাসা 'ধনী-গরিবের সমান'–এ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মমতাদির বেতন কত টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল?

ক. ১০ টাকা খ. ১২ টাকা

গ. ১৫ টাকা ঘ. ১৮ টাকা

২। চড় খাওয়ার বিষয়টি দিদি কেন গোপন রেখেছিলেন?

ক. লজ্জা পেয়ে
খ. আত্মসম্মানের জন্য
গ. বিপদের আশঙ্কায়
ঘ. চাকরি যাওয়ার ভয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মা মারা গেলে নিরাশ্রয় কেষ্টা বৈমাত্রেয় বোন কাদম্বিনীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত আগমন কাদম্বিনী ভালোভাবে নেয়নি বরং মনে মনে সে ভীষণ অখুশি। তাকে দিয়ে প্রতিনিয়ত সংসারের নানা কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কারণে-অকারণে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করে। নিরুপায় কেষ্টা সবকিছু নীরবে সহ্য করে।

৩। যে বিচারে কেষ্টা ও মমতাদি একসূত্রে গাঁথা তা হলো–

i. দারিদ্র্য
ii. অসহায়ত্ব
iii. নিরাশ্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i. ও ii খ. ii ও iii
গ. i. ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাসেল ড্রাইভার হিসেবে যেমন দক্ষ তেমনি সৎ। প্রকৌশলী এমারত সাহেব তাকে ব্যক্তিগত ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দেন। ইফতি, সনাম ও শিলাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসাই তার প্রধান কাজ। ঘরের সবাই ওকে ভীষণ ভালোবাসে। ইফতিরা ওকে ভাইয়া বলে ডাকে, একসাথে খায়, গল্প করে, বেড়াতে যায়। রাসেলের প্রতি সন্তানদের এই আচরণে এমারত সাহেব ভীষণ খুশি।

ক. মমতাদির বয়স কত ছিল?
খ. মমতাদির চোখ সজল হয়ে উঠেছিল কেন?
গ. উদ্দীপকে রাসেলের মাঝে বিদ্যমান মমতাদির বিশেষ গুণটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রাসেল ও মমতাদির প্রতি দুই পরিবারের আচরণের ফুটে ওঠা দিকটি সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে কতটুকু প্রভাব ফেলে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

রহমানের মা

রণেশ দাশগুপ্ত

[**লেখক-পরিচিতি :** রণেশ দাশগুপ্ত ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। ১৯৪৮ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হন। পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি অনেকবার কারাবরণ করেন। সাহিত্য-চর্চায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, আলো দিয়ে আলো জ্বালা, উপন্যাসের শিল্পরূপ* ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতি তখন উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো, বুঝি তা অনন্ত ভবিষ্যতের অভিসারী। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাছাইকরা খুনেরা যে হাজার হাজার মেয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল তাদের বীরাঙ্গনা বলা হচ্ছে এবং তারা সামাজিকভাবে সমাদর পাচ্ছেন। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর করোটি সরিয়ে ফেলা হলেও সেগুলো কারও মন থেকে সরে যায়নি। ঢাকায় শহিদ মিনারের চত্বর থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গার বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার আশেপাশে দখলদার বাহিনী আগুন লাগিয়ে যেসব এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলোর অঙ্গার তখনো যেন কালো কালো আঙুলে শহরের আকাশকে বিঁধছে। এই অবস্থায় ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকতার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা আর বীরাঙ্গনাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। শহিদদের নামে এলাকায় এলাকায় জয়-জয়কার করা হচ্ছে। একই সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে শহিদদের আত্মীয়-স্বজনকেও।

মহানগরীতে সভা-সমিতির একটা বড় আকর্ষণ শহিদের কোনো প্রিয়জনকে উপস্থিত করা। এই রেওয়াজ সামনে রেখে ঢাকার শহরতলিতে একটা মহল্লার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে জানানো হয়েছিল সভায় রহমানের মা উপস্থিত থাকবেন। ৭১-এর ২৬শে মার্চের রাতে মহল্লার চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে আবদুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাঁজোয়া বাহিনীর বিশাল ঢলের সামনে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় রাস্তার ভাঙাচোরা নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি একটা ব্যারিকেডের পেছনে। বলা বাহুল্য, প্রাণ দিয়েছিল। তার প্রৌঢ় মাকে এতদিন মহল্লার সবাই চুপি চুপি সান্ত্বনা জানিয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরে আর সান্ত্বনা নয়। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা।

একটা স্কুলবাড়ির আঙিনায় চেয়ার পেতে সভা। স্কুলের বারান্দায় মঞ্চ। তার সামনের চেয়ারগুলোতে মহল্লার গণ্যমান্য পুরুষেরা। মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে একজন নামকরা লোকের চেয়ারের পাশে সভাপতির চেয়ার, তার পাশেই রহমানের মায়ের জন্য চেয়ার। মঞ্চে টেবিলে একটা সদ্য ধোয়া সুজনির ওপর হারমোনিয়াম আর ফুলদানি। মহল্লার যে সব জোয়ান ছেলে রহমানের সঙ্গে একত্রে নানা রকম সামাজিক রাজনৈতিক কাজ করেছে, তারা ঘোরাফেরা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের দুটি মেয়ে রয়েছে এদের সঙ্গে।

সভা শুরু হলো। মহল্লার একজন বৃদ্ধ কোরআন থেকে পাঠ করলেন। এরপর 'জাতীয় সংগীত' সোনার বাংলা গাইলো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সভাপতি ঘোষণা করলেন রহমানের মা আসছেন। সবাই দেখলো কয়েকজন যুবক ছেলের আগুপিছুতে রহমানের মা সভায় ঢুকছেন। একঝলকেই সবাই দেখলো তাঁকে। আপাদমস্তক বোরকায় মোড়া। পায়ে পাতলা চটি, তাদের মধ্যে শীর্ণ দুটি পা। বোরকার বাইরে দুদিকে দুটি নিরলঙ্কার হাত মাঝে মাঝে রহমানের সাথী যুবক ছেলেদের কাঁধে ভর করা। গতি ক্ষিপ্র, বারান্দায় উঠলেন কয়েক লহমার মধ্যে আঙিনায় ঠাসাঠাসি করে বসানো চেয়ারের ফাঁকগুলোকে পেরিয়ে। তাঁকে তরুণীরা চেয়ারে বসিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রধান অতিথি ভাষণ দিলেন সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শহিদ আবদুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। সভাপতি মহল্লার বনেদি সমস্ত বাসিন্দার পক্ষ থেকে রহমানের মায়ের গৌরবের কথা বললেন একবারে ঘরোয়া ভাষায়।

বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা রহমানের মা কাঠের পুতুলের মতো চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে বক্তৃতা শুনলেন। ডান হাতে ধরা রইল মুখের ওপর দুচোখের দুটো ছ্যাঁদাওয়ালা আবরণীর ফালিটি। এরপরে যথারীতি গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। আবদুর রহমানের যুবক সাথীরা দুচার কথা বলে চাচি আম্মাকে সান্ত্বনা জানালো। অবশেষে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো রহমানের মাকে।

রহমানের মা কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, "রহমাইন্যা চাইছিল দ্যাশটারে স্বাধীন করতে। দ্যাশ স্বাধীন হইছে। এহন আপনারা দ্যাশের দশজনে যদি দ্যাশের মাইনষেরে খাওন পরন থাকন দিবার পারেন, তাইলে আপনারা আপনেগো কাম করবেন। মহল্লার মাইয়্যা ছ্যাওয়ালগো লেহাপড়া শিখানোর এই ইস্কুলটার লাইগ্যা রহমান খাটছে। এই ইস্কুলটা যেন থাহে। আমি আমার রহমাইনারে দিছি। অরে কোলে কইরা বেওয়া হইছিলাম। এতটা ডাগর করছিলাম। আমার আর কিছু নাই। তবু কই। দ্যাশের লাইগ্যা যদি কাজে ডাকেন, আমু। আমি শহিদের মা। আমি রহমানের মা।"

হাততালিতে সভা জমজমাট হয়ে উঠল। এরপরেই রহমানের মা একটা অঘটন ঘটালেন। তিনি তাঁর মুখের ওপর নেমে আসা বোরকার একফালি আবরণীকে এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে দিয়ে সমস্ত সভার দিকে দৃপ্ত নয়নে তাকালেন। তাঁর দারিদ্র্য ও শোকে-দুঃখে শীর্ণ মুখখানিতে অপূর্ব গর্বের দীপ্তি। মহল্লার প্রবীণতমদেরও প্রতি তিনি আজ আর সংকোচ পোষণ করলেন না। পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর পাশের তরুণী দুটিকে দুহাতে টেনে নিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কয়েক লহমার মধ্যে ঠাসাঠাসি চেয়ার আর লোক ভেদ করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবরণীটি মাথার ওপরেই তোলা রইল। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : খুনেরা– যারা হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। **কঙ্কাল**– দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থি। **করোটি**– মাথার খুলি। **অঙ্গার**– কয়লা। **মহল্লা**– শহর বা নগরের অংশ। **প্রৌঢ়**– যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী বয়সপ্রাপ্ত। **সুজনি**– শয্যার জন্য নক্‌শা করা বিশেষ চাদর। **আপাদমস্তক**– পা থেকে মাথা পর্যন্ত। **নিরলঙ্কার হাত**–যে হাতে অলঙ্কার পরা নেই। **লহমার**– মুহূর্তের। **আবরণী**– এখানে মুখ ঢেকে রাখার বস্ত্রখণ্ড বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি : গল্পটি রণেশ দাশগুপ্তের *রহমানের মা ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ* থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। বয়স্কা রহমানের মা-ও অংশগ্রহণ করেন। নিজপুত্র রহমানকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি এই মহৎকর্মে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ-

পরবর্তীকালে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গৃহের অভ্যন্তরে থাকা রহমানের মা প্রকাশ্যে আসেন। তিনি সবার উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাধীন দেশে দেশগড়ায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। নারীশিক্ষার জন্য নারী-বিদ্যালয় অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য, প্রয়োজন হলে, এই অধিক বয়সেও যে-কোনো কাজ করতে তিনি প্রস্তুত। শেষে রহমানের মা গৃহের অভ্যন্তরে আর ফিরে না গিয়ে মিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। চমৎকার এই গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে এক শহিদ জননীর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম। এ গল্পের ভাববস্তু হলো: মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে; মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ অর্জিত হয়েছে, কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজ করে প্রতিনিয়ত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেসব অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল তার একটি তালিকা কর।

২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজ গঠনে তুমি কী কী কাজে অংশ নিতে পার তা লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারীদের স্মৃতি কীসের মতো?

ক. উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো
খ. হাঁটতে শেখা বিড়ালের বাচ্চার মতো
গ. দৌড়াতে শেখা ঘোড়ার বাচ্চার মতো
ঘ. দাঁড়াতে শেখা মানুষের বাচ্চার মতো

২। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা– বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক. রত্নগর্ভা মা
খ. অপমানিত মা
গ. নির্যাতিত মা
ঘ. চিরন্তনী মা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান। সেখানে অলঙ্কার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একজন ভাষাসৈনিককে। এতে তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং পাশাপাশি তরুণ প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে।

৩। উদ্দীপকের আমন্ত্রিত অতিথি 'রহমানের মা' গল্পে যে চরিত্রকে ইঙ্গিত করে–

i একজন বৃদ্ধ
ii রহমানের মা
iii মেয়ে দুটি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

৪। উদ্দীপকের সঙ্গে 'রহমানের মা' গল্পের কোন বিষয়টির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে?

ক. শহিদ পরিবারকে পরিচিত করানো

খ. অতীতের রেওয়াজ অনুসরণ

গ. শহিদ পরিবারকে মূল্যায়ন করা

ঘ. বর্তমান ধারার রীতি অনুসরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

'আসাদের মৃত্যুতে আমি
অশ্রুহীন; অশোক; কেননা
নয়ন কেবল ব্রজবর্ষী, কেননা
আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন : কেননা আমার বৃদ্ধামাতার
কণ্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই
অভিসম্পাত– কেবল
দুর্মর ঘৃণার আগুন।'

ক. চেয়ার পেতে সভা বসেছিল কোথায়?

খ. 'জয়-জয়কার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের আসাদ 'রহমানের মা' গল্পের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে– তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের বৃদ্ধা মাতাই যেন 'রহমানের মা' গল্পের রহমানের মা চরিত্রের প্রতিকৃতি "– মন্তব্যটি বিচার কর।

বনমানুষ

আবু ইসহাক

[**লেখক-পরিচিতি :** আবু ইসহাক ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর শরীয়তপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আই.এ. পাশ করার পরই সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গ্রামবাংলার চিত্র এবং সেখানকার সমস্যা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। এদিক থেকে তাঁর *সূর্যদীঘল বাড়ি* উপন্যাসটিকে বাস্তব জীবনের সার্থক চিত্রণের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উপন্যাস-সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো : *সূর্যদীঘল বাড়ি, হারেম, মহাপতঙ্গ, পদ্মার পলিদ্বীপ* ইত্যাদি। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

নতুন চাকরি পেয়ে কলকাতা এসেছি। সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি। যে-কোনো সময়ে, বিনা-কারণে ও বিনা নোটিশে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগপত্রে এসব শর্ত দেখেও ঘাবড়াইনি একটুও। বন-বিভাগে চাকরি করতাম ষাট টাকায় এখানে পাব একশো তিরিশ টাকা। দ্বিগুণেরও বেশি। এমন সুবর্ণ সুযোগ কোনো নির্বোধ পায়ে ঠেলে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর যাই হোক, আমি দুপায়ে হাঁটি। জঙ্গলে যারা চার পায়ে হাঁটে, তাঁদের পরিবেশে থেকে আমার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়নি। সত্তর টাকা বেশি পাব– এ কি যেমন- তেমন ব্যাপার! বিয়ে করেছি অল্পদিন। এখন দ্বিগুণ টাকারই দরকার। তাছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্যসমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।

চাকরিতে যোগ দিয়েছি গতকাল। আজ দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। ন'টা না বাজতেই খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। মেসের খাওয়া। কী খেলাম বলব না, বলতে লজ্জা করে। তাছাড়া খাওয়াটা গৌণকর্ম, নেহায়েতই রান্নাঘরের ব্যাপার। যা মুখ্য তা হচ্ছে আমাদের পোশাক। সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি কোনোরকমে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও এ-দেহকে দুরস্ত খোলসে ঢেকে ভদ্রলোক সাজতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই ভদ্রসমাজে বের হওয়ার। আমাদের মতো খুদে অফিসারদের ব্যাপার আরো জটিল। কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে দুরস্ত হওয়া চাই, নয়তো ওপরওয়ালা সায়েবদের সুনজর হবে না কোনোদিন। তাঁদের কথা : ঘোড়ায় চড়ে না হোক, গাধায় চড়েও কেন আমরা তাদের অনুসরণ করব না? অফিসে তাই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের হয়ে দাঁড়ায়।

মেসের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে গলগ্রন্থিটা কোনোরকমে বেঁধে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিই। আয়নায় মুখ দেখে ভালো লাগে না। দাড়িগুলোর কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। অথচ গতকালই দাড়ি কামিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি সেফটি রেজার বের করে ঐ অবস্থায়ই কয়েক পোঁচ টেনে নিই। কিন্তু শার্টের কলারটায় সাবানের ফেনা লেগে যায়। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে চুলে চিরুনি চালাই আর-একবার। তারপর জুতোজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে আর একদফা আয়নায় মুখ দেখে বেরিয়ে পড়ি।

ন'টা বাজে। পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকি। গলি নয় ঠিক। দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরুপথ। গা বাঁচিয়ে একজন যেতে পারে কোনোমতে। মাঝপথে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক আসছিলেন ওদিক থেকে। দেহের

আয়তন তার নিতান্ত ছোটো নয়। তাই কোলাকুলিটা হয়ে যায় ভালোভাবেই। তারপর একজন, আরো এক, আরো একজন। কোলাকুলি সেরে বেরিয়ে যান তারা। কোলাকুলিটা যদিও সকলের সঙ্গে সমান জমে না, তবুও মনে হয় মানুষে মানুষে হানাহানির এ সময়টায় অজানা-অচেনায় এরকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।

আর মাত্র কয়েক কদম পার হলেই বড় রাস্তা। দেয়াল ছেড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্রমহিলা গলিটায় ঢুকে পড়েছেন। আমার সামান্য কয়েক কদমের পথটুকু পার হবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়েই আসছেন তিনি। এবার আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পিছু হেঁটে শেষটায় উপায় করতে হয় আমাকেই।

দেয়ালে ঠেস্ দেওয়ায় শ্যাওলা লেগেছিল কোটে। রুমাল বের করে ঝেড়ে আমার পথ দেখি আমি। এবার আর সোজাপথে নয়। সোজাপথটাই দেখছি কঠিন বেশি। বেনেপুকুর লেন ঘুরে লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে ইলিয়ট রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াই।

ধর্মঘটের জন্যে ট্রাম বন্ধ। আমাকে যেতে হবে ৮ নম্বর বাসে। এক এক করে কয়েকটা বাস চলে যায়। কতবার হাতল ধরতে গিয়ে পিছিয়ে যাই। সাহসে কুলোয় না। লোকসব বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ হবার পাত্র আমি নই। দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি অন্তত একটা পা রাখবার জায়গাও যদি মিলে যায়।

একটা বাস এসে থামে। পা রাখবার জায়গা নেই। তবুও সব লোক ছুটোছুটি করছে, কে কার আগে উঠবে। চাকরি ঠিক রাখার কী প্রাণান্ত চেষ্টা। একটা লোক নেমে যায় ড্রাইভারের কুঠরি থেকে। মহাসুযোগ! পাশের কয়েকজনকে টেক্কা মেরে চট করে উঠে পড়ি আমি। চাকরি গেলে আমার চলবে না। হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কা মেরে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'মানুষ, না জানোয়ার!'

লোকটা কি গণক নাকি! গণকের মতো ঠিকই তো বলেছে সে! আমি জঙ্গলেই তো ছিলাম অ্যাদ্দিন!

লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। ঘাড়টা নুইয়ে গায়ে গায়ে মেশামেশি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মেশামেশিটা আগের কোলাকুলির মতো প্রীতিকর হয় না। আমি শেষে ঢুকে অনেকের অসুবিধে করেছি। ঠেলা-ধাক্কাটা তাই আমার দিকেই আসছে বেশি করে। পাঁজরের হাড়গুলো চাপ খেতে খেতে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। আর দেরি নয়। পরের স্টপে থামতেই আমি নেমে যাই।

এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল যেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সজীব করে নিই খোলা বাতাসে। স্যুটটার দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। ভেতরের ঘামে আর ওপরের ঘষায় ইস্ত্রি ভেঙে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এবার পাদুটোকে সম্বল করেই ছুটব ঠিক করলাম।

কলকাতা এসেছিলাম অনেকদিন আগে একবার। পথ-ঘাট ভালো মনে নেই। পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকের দিকে। এই পোশাক ছাড়া কার কী ধর্ম জানবার উপায় নেই। কারণ ধর্মের কথা গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মাপরাধীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমার চেহারা দেখে কিন্তু কারো বুঝবার যো নেই, আমার ধর্ম কী। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধার্মিক পোশাকে ঢেকে নিয়েছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ?

আন্তঃধার্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে-কোনো দিকের চাকু খাওয়ার ভয় আছে আমার। মুসলমান মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হলো!

ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করে। মন ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। একশো তিরিশ টাকার চাকরিটার ভার ছেড়ে দিই পাদুটোর ওপর। শুধু তাই নয়, মনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেহের ভারটাও।

এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। কাছাকাছি একটা প্রাণীও দেখছি না যে! বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সুমুখের একটা দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকজন কী যেন দেখছে রাস্তার দিকে। ওপর থেকে নিচের দিকে চোখ নামাতেই চোখ ফিরে আসে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিনতে ভুল হয় না। মানুষ! হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। রক্তের রাঙা স্রোত ড্রেনে গিয়ে মিশেছে।

নিমেষে পেছন ঘুরে অন্য পথ ধরি। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও তাকাই না ফিরে। কিন্তু কে যেন গর্জে ওঠে, 'ঠায়রো।'

দুজন সার্জেন্ট রিভলবার হাতে এগিয়ে আসে। আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তারা। কিন্তু ফাঁসাতে পারে না। নিয়োগপত্রটা পকেটেই ছিল। সেটা দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যাই।

এবার আরেকটা রাস্তা ধরে হাঁটি। হাঁটি সুমুখে পেছনে চেয়ে। মারটা নাকি পেছন থেকেই আসে। এক একজন লোক চলে যায় পাশ কেটে, মনে হয় এক-একটা ফাঁড়া কেটে যায় আমার। আমার সতর্ক চোখদুটো আড়চোখে তাকায় সবার দিকে। কিন্তু তারাও যে সতর্কদৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকায়! আমাকে-আমার হাত দুটোকেই বোধহয় তাদের ভয়। তাদের ভীত চাউনি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমিও আমার অনুগত হাত দুটো ছাড়া আর কারো হাতকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদূর আগে ডানদিকে একটা পাশগলি। গলির মুখে তিনটে লোক। তাদের পোশাক দেখে চমকে উঠি। তাদের ভাবগতিকও কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ শুরু হয়েছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণী উঁচু-গোড়ালি জুতো পায়ে আসছে গটগট করে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যাই। গলির মুখের লোকগুলোকে বোঝাতে চাই, আমি তরুণীটির জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারই সাথী আমি। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলে হয়। আমার যেরকম গায়ের রং! অবশ্য এরকম রঙের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের অভাব নেই কলকাতা শহরে।

আমার পোশাক দেখে লোকগুলো না হয় আমাকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠাওরাল। কিন্তু তরুণীটিকে কী বোঝাব? আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী মনে করবে সে?

আমি উবু হয়ে বাঁ-পায়ের জুতো খুলি। জুতোর ভেতর কাঁকর ঢুকেছে এমনি ভান করে জুতোটা উপুড় করে ঝেড়ে নিই কয়েকবার। তারপর আবার পায়ে ঢুকাই। তরুণীটি আমার কাছে এসে গেছে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে এবার তার পাশাপাশি চলতে শুরু করি। এখন ঠিক মনে হচ্ছে– রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতি। অন্যের কী মনে হচ্ছে জানি না। আমার কিন্তু ওরকমই মনে হচ্ছে। এক-পা-দুপা করে গলির মুখ পার হয়ে যাই।

ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার নীরব সঙ্গিনী একবার কটমট করে আমার দিকে তাকায়। তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মনটা মিইয়ে যায়। কিন্তু তবুও তার সঙ্গ ছাড়তে ভরসা পাইনে।

পাশাপাশি হেঁটে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাই। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে সে, 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'না-না–।' আমি থতমত খেয়ে যাই।

'না মানে! বহুক্ষণ ধরে আমি লক্ষ করছি। পুলিশ ডাকব?

'না-না, মানে-ইয়ে, মানে গুন্ডার ভয়ে'–

'গুন্ডার ভয়ে!'

'হ্যাঁ, তাই– তাই আপনার সাথে সাথে এলাম।'

'অবাক করলে! এক জোয়ান পুরুষ, তাকে রক্ষা করবে মেয়েমানুষ! আচ্ছা কাপুরুষ তো!' অবজ্ঞার হাসি তরুণীটির মুখে।

কিছুদূর গিয়ে মহিলা বাঁ-দিকে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। আমি মোড় নিই ডানদিকে।

পাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে আসছে না আমার দিকে!

'উহ্ মাগো' বলে লাফ দিয়ে সরে যাই কয়েক হাত। ফিরে দেখি একজন জটাধারী ফকির হাসছে আমার অবস্থা দেখে। এগিয়ে এসে সে বলে, 'ভয় পেলি নাকি? দুদিন খেতে পাইনি। দুটো পয়সা দে।'

রীতিমতো ঘাম দিয়েছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তবু হাতে চাকু না-থাকার জন্যে ফকিরটাকে ধন্যবাদ দিই মনে-মনে আর পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে তার দিকে ছুঁড়ে মারি।

চৌরঙ্গী এসে পড়েছি। একটা লোক হঠাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'ফটো তুলবেন? আসুন। এক টাকায় তিন কপি।'

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। মানুষের ভয়ে ভীত মানুষের ফটোটা তুলে রাখা উচিত ছিল আমার।

হঠাৎ কার স্পর্শে শিউরে উঠি।

চেয়ে দেখি, আমাদের সুভাষ মুচকি হাসছে। সহপাঠী বন্ধুর আলিঙ্গনে বুকের ভেতরটা যেন ভিজে ওঠে। কিন্তু ওর বুকটা শক্ত লাগল না! জামার ওপর হাত রাখি। তাই তো!

সুভাষ হেসে বলে, 'হাত দিয়ে দেখছিস কী?'

'দেখছি, মানে–তোর বুকটা শক্ত লাগছে কেন রে?'

'শক্ত লাগছে হুঁহ্ হুঁ! এ জিনিস দেখিস নি কখনো। লোহার তারের গেঞ্জি। একেবারে নয়া আবিষ্কার।

'নয়া আবিষ্কার।'

'হ্যাঁ, এ বর্ম ভেদ করবে চাকু? উঁহু–!

সুভাষের জামার ওপর হাত দিয়ে দিয়ে আঁচ করতে পারি, লোহার তার দিয়ে তৈরি হাতাকাটা গেঞ্জি। মন্দ জিনিস নয়। সহসা আঘাত করে কিছু করতে পারবে না।

আমি হেসে বলি, 'কিরে চাকু-টাকু লুকানো নেই তো?'

'নেই তো কী! নিশ্চয়ই আছে। এক্ষুনি তোর বুকে বসিয়ে দেব। তোর রক্ত দিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে কালীপুজো করব।'

'এখানে কী করিস?'

'পড়ি আর্ট স্কুলে।'

'আর্ট স্কুলে! ঠিক আছে। শোন, তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে। মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে। পারবি তো?'

'তা দেখব চেষ্টা করে।'

আরো দু-এক কথা বলে বিদেয় হই তাড়াতাড়ি।

হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গী পর্যন্ত আসি। কিন্তু পা আর চলে না। চলবার কোনো হেতু নেই যে! ভোরে যা খেয়েছি, আর এ-পর্যন্ত এক পেয়ালা চা-ও না। কার্জন পার্কে বসে পড়ি। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। ভিড় কমলে বাসেই যাব।

সাড়ে ছ'টার সময় বাসে একটু জায়গা পাওয়া যায়। পঁ-পঁ করতে করতে বাস ছুটছে। এত ভিড়, বাইরের কিছুই দেখা যায় না। বুঝতে পারছি না, কোন রাস্তা ধরে চলছে গাড়ি।

বুম্-ম্—

আবার বুম্—ম্—

ভীষণ শব্দ। কানে তালা লেগে গেছে। শুনতে পাই না কিছু। শেয়ালের ভয়ে খাঁচার মোরগের মতো করছি আমরা।

তারপর কোন দিক দিয়ে কেমন করে বাসখানা চলে এল, অত খেয়াল নেই। কয়েকজনের মুখে শুনলাম, বাসের পাদানির ওপর থেকে দুজনকে দুপেয়ে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। আর অনেকের হাত-মুখ নাককান ছিঁড়ে গেছে বোমার আঘাতে।

ঘরের কাছে এসেও আর-একবার শিউরে উঠি। অক্ষত দেহে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিথিল শরীরটাকে টেনে এনে বিছানায় ঢেলে দিই। মানুষের মাঝে একদিন চলেই মুষড়ে পড়েছি আমি। আমার সমস্ত রাগ ঘৃণা আজ মানুষের ওপর।

চোখ বুজে ভাবছি— পদত্যাগপত্রটা প্রত্যাহার করার এখনো হয়ত সময় আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটা ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহরে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : হিংস্রালয়- হিংস্র প্রাণীর বাসস্থান। **গলগ্রন্থি**- গলার বন্ধনী। **ছাতলা**- শ্যাওলা, দেয়ালে জমা পুরানো ময়লা। **অ্যাদ্দিন**- এতদিন শব্দের কথ্যরূপ। **ঠ্যায়রো**- দাঁড়াও। **ঠাওরালো**- মনে করল। **চৌরঙ্গী**- চার রাস্তার মিলনস্থল। কলকাতার একটি স্থানের নাম।

পাঠ-পরিচিতি : ভারত বিভাগের আগে ১৯৪৬ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে 'বনমানুষ' গল্পটি লিখিত। এ গল্পের লেখক বনবিভাগে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। তিনি দ্বিগুণ বেতনে কলকাতায় চাকরি করতে আসেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তাঁর নিজেকে সভ্য মানুষ মনে হতে থাকে। কিন্তু তিনি তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানির মুখোমুখি হতে থাকেন। তিনি দেখেন এ শহরের মানুষেরা ধর্মের নামে পরস্পরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। বনের পশুপাখিরাও এ রকম পরস্পরকে হত্যা করে না। তখন লেখক আবার বনবিভাগের চাকরিতে ফিরে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লেখকের কাছে এ শহরের সভ্য মানুষের চেয়ে বনে বসবাসকারী অশিক্ষিত মূর্খ মানুষকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। '*বনমানুষ*' গল্পটি সংকীর্ণ ধর্ম-পরিচয়মুক্ত মানবিক বোধসম্পন্ন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে সহায়তা করে; কারণ ধর্ম নিয়ে মানুষে সংঘাত মানুষ পরিচয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা জীব হিসেবে মানুষ অন্য সব প্রাণীর তুলনায় জ্ঞান, বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতায় শ্রেষ্ঠ।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার দেখা অন্য ধর্মের প্রধান একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরণ দাও।

২। ঢাকা শহরের রাস্তায় তোমার একদিনের যাতায়াতের বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। লেখক কোনটিকে গৌণকর্ম মনে করেন?

ক. কোট পরা   খ. খাওয়া
গ. বেতন নেওয়া   ঘ. অফিসে যাওয়া

২। 'আঁধার ছেড়ে আলোকে' এখানে কোনটিকে আঁধার বলা হয়েছে?

ক. শহুরে জীবন   খ. অন্ধকার অবস্থা
গ. বনের জীবন   ঘ. আলোকিত অবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

বন্যা শেষে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এ সময় বিমান এসে বস্তাভর্তি খাবার ফেলে দিলে মানুষ, পশু, পাখি সবাই ক্ষুধা নিবারণ করে। কিছুদিন পর আবারও বিমান আসে। চড়ুই দম্পতি তা দেখে ভীষণ খুশি। এক সময় বিমান থেকে ফেলা বোমার আঘাতে মারা যায় মানুষ, পশু, পাখি। ধ্বংস হয় গাছপালা। তখন ঐ চড়ুইয়ের কণ্ঠে শোনা যায় ছি! ছি!! ছি!!!

৩। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা যে বিষয়টি 'বনমানুষ' গল্পের বিশেষ দিককে ইঙ্গিত করে, তা হলো–

i. আধুনিকতা
ii. নেতিবাচক মনোভাব
iii. সভ্যতার মুখোশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪। চড়ুইয়ের অনুভূতির সঙ্গে লেখকের একাত্মতা প্রকাশে কোন বক্তব্যটি যথার্থ?

ক. অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের।
খ. সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি।
গ. অজানা-অচেনায় এ রকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।
ঘ. আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গ্রীষ্মের ছুটিতে মনির তার মামার বাড়ি কলকাতায় বেড়াতে গেল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই মামাবাড়ি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। মামা, মামি, মামাতো ভাই-বোনরা তার সাথে ভালোভাবে কথা বলত না। মামি তার দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া শুরু করল। মামাবাড়ির বন্ধ দেয়াল তার কাছে জেলখানা মনে হলো। তার বারবার মনে পড়তে লাগল ফেলে আসা গ্রামের বিরাট সবুজ মাঠ, নদী, বন্ধু-বান্ধব, আপনজনের চেহারা।

ক. ধর্মঘটের জন্য কী বন্ধ হয়েছিল?

খ. কথক বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হতে চান কেন?

গ. উদ্দীপকের যে ভাবটি 'বনমানুষ' গল্পে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের মনির যেন 'বনমানুষ' গল্পের কথকেরই প্রতিনিধিত্ব করছে"– উক্তিটি যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

[**লেখক-পরিচিতি:** জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩রা মে মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাহানারা ইমাম ১৯৪৭ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড ও বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর প্রথম সন্তান রুমী যোগদান করেন। রুমী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে জাহানারা ইমাম সহযোগিতা করেন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্যের জোগান, গাড়িতে অস্ত্র আনা-নেওয়া এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়া, খবর আদান-প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তিনি সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের শেষদিকে রুমি শহিদ হন। জাহানারা ইমাম শহিদ জননী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ওপর স্মৃতিচারণমূলক তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি* সর্বত্র সমাদৃত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হলো: *গজকচ্ছপ*, *সাতটি তারার ঝিকিমিকি*, *ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস*, *প্রবাসের দিনগুলি* ইত্যাদি। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ শে জুন এই মহীয়সী নারী পরলোকগমন করেন।]

১৩ই এপ্রিল : মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হলো, রোববার তো দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে রোদ দেখা গেছে। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল, 'রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাঁক-শিয়ালির বিয়ে হয়।' কিন্তু আমার মনে পাষাণভার। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সামনে সোফায় বসে বলল, 'ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?'

'কোথায় যাব? অন্ধ, বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোনো ভয় নেই!'

'নেই, মানে? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো–'

'হল তো সব খালি, বিরান, যা হবার তা তো প্রথম দুদিনেই হয়ে গেছে। জানো, বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?'

'তাই নাকি? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।'

'তাহলেই দেখ– ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।'

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, 'খুব দামি কথা বলেছেন ফুফুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।'

শিউরে উঠে বললাম, 'রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে।'

১০ই মে : সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছুদিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয় নি। আজ সকালে নাশতা খাবার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ কটা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরনের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়– যা গত দুমাসে হয়নি। খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের 'পিস্' অর্থাৎ 'শান্তি'। কালচে-মেরুন 'বনি প্রিন্স' আর 'এনা হার্কনেস। ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের 'সিমোন' আর 'ল্যাভেন্ডার।' হলুদ 'বুকানিয়ার', সাদা 'পাস্কালি'।

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনো আমার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য আর নেই, ফুটে গেছে এবং প্রায় ঝরে পড়ার অবস্থা। 'পিস'-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে– যদিও সারাদেশ থেকে 'পিস' উধাও।

বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধ করি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে।

১২ই মে : বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার হুকুম হয়েছে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী– চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোনো ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণির ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি– যে যতটা পারি।

জামী তার দু-তিনজন বন্ধুর সাথে ঠিক করেছে– ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশোনা করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় ওরা হাঁপিয়ে উঠবে না।

১৭ই মে : সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টিচার, রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ববাংলার কোনো প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে।

২৫ শে মে : মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধ্যার পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।'

দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেহ আহমদ নামটা আগে কখনো শুনি নি। রুমী বলল, 'নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

বললাম, 'হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।' এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদপাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা কথিকা পড়লেন– চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে একেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্তু এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।

শরীফ বলল, 'ঐ যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষে নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, এটা আলটিমেটাম।'

'কি জানি।'

জামী জানতে চাইল, 'গাজুরিয়া মাইর কি জিনিস?'

রুমী বলল, 'জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু কাউকে জিগ্যেস করে নেব।'

ঐ যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল– ঢাকার ছ'জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করি নি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচে-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলারা প্রতিঘাতের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডারঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদ ঢাকাতেও?

মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারী যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর : রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে গত দুদিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কি করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধব নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হলো : যে কোনো প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে– শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে 'তাই করা হোক' বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে– ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনি সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা। গত দুরাত শরীফ ঘুমোয় নি, আমি একবার বলেছি, 'তোমার কথাই ঠিক। ঐ খুনী সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।' আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, 'না, মার্সি পিটিশন কর।'

এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দুদিন দুরাত। শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে– না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

১১ই অক্টোবর : সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, 'সেই যে মাস খানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।'

'কী শুনে এলে? কোথায় শুনলে?'

'ডা. রাব্বির কাছে। রাব্বি– জানো তো, আমাদের সুজার ভাস্তে।'

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডা. ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, 'আজ ফকিরের অফিসে গেছিলাম, ওখানে রাব্বির সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিয়ুর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিয়ুর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেইখানে ৩০ তারিখে মতিয়ুরের চল্লিশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চল্লিশায়। মিসেস মতিয়ুর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরুজ্জামানের শালী।'

'আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও– এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়– মিলি এর নাম।'

ডলির কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জামান স্যার, ওদের কোনো খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে– কে জানে। ওপারেও যায় নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনতে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা- চেনা লেগেছিল, দু একদিন পরেই চিনেছিলাম– সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হলো আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়– রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়– এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৬ই ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল নটা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ-বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেলে তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাকিস্তানি আর্মি নাকি সারেন্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এলো সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাথাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মালিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক জখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ যদি সারেন্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।'

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ.কে.খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে। যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : জামী– লেখিকার ছোট ছেলে। **বিরান–** জনমানবহীন, পরিত্যক্ত, ফাঁকা। **খুরপি–** মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার ছোট খন্তা। **শরীফ–** লেখিকার স্বামী। **রুমী–** জামীর ভাই। **অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তা–** রুদ্ধ বা আটক অবস্থায় কর্মহীনতা। **কূটকৌশল–** চতুরতা, দুর্বুদ্ধি। **বেয়নেট–** বন্দুকের সঙ্গিন, বন্দুকের অগ্রভাগে লাগানো একপ্রকার বিষাক্ত ও ধারাল ছোরা। **স্তম্ভিত–** হতবাক, বিস্মিত। **গোয়েবলস্ (১৮৯৭-১৯৪৫)–** জার্মান বংশোদ্ভূত হিটলারের সহযোগী, রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা রটনার প্রবর্তক। **কথিকা–** নির্দিষ্ট ও ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনাত্মক রচনা। **চরমপত্র–** মৃত্যুর পূর্বসময়ে লিখিত উপদেশ, শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পত্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য 'স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে এম. আর. আকতার মুকুল কর্তৃক লিখিত হানাদার বাহিনীর অপকীর্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য নিয়ে হাস্যরসাত্মক এই কথিকাগুলো প্রচারিত হতো। এই কথিকাগুলো 'চরমপত্র' নামে খ্যাত। **আলটিমেটাম–** চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ। **গাজুরিয়া মাইর–** গজারি কাঠের মতো শক্ত ও ভারী কাঠের লাঠি দিয়ে মার দেওয়া। **মার্সি পিটিশন–** শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন। **লহমায়–** মুহূর্তে।

পাঠ-পরিচিতি : জাহানারা ইমাম রচিত *একাত্তরের দিনগুলি* শীর্ষক দিনপঞ্জির আকারে রচিত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ থেকে পাঠ্যভুক্ত অংশটুকু গৃহীত হয়েছে। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সন্তান রুমীকে হারিয়েছেন। এই রচনায় গভীর বেদনার সঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে তিনি তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলায় প্রথমেই ঢাকার নগর-জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। শিশু-কিশোররা স্কুলে যাবে না। কিন্তু হানাদার বাহিনী জোর করে স্কুল-কলেজ খোলা রাখবে; বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে জোর করে রেডিও-টিভিতে বিবৃতি প্রদান করাবে; আর হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নি সংযোগ তো আছেই– এই ছিল সেই দুঃসময়ে ঢাকার অবস্থা। '*একাত্তরের দিনগুলি*' মুক্তিযুদ্ধে মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অংশগ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরে। সন্তানের প্রতি গভীর মমতা ও সংবেদনশীল অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও জাতির প্রয়োজনে সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন জাহানারা ইমাম। স্মৃতিচারণমূলক এ লেখা মুক্তিযুদ্ধে নারীর সক্রিয় ও সরব অংশগ্রহণের বিবরণ উপস্থাপন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা তৈরি কর।

২। তোমার পঠিত মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত অন্যান্য গল্প/কবিতা/উপন্যাসের যে কোনো একটির আলোচনা বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় মে মাসের কোন তারিখে মাধ্যমিক স্কুল খোলার কথা বলা হয়েছিল?

ক. আট তারিখ　　খ. নয় তারিখ

গ. দশ তারিখ　　ঘ. এগারো তারিখ

২। 'নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি' বলতে কী বুঝ?

ক. বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল　　খ. বেয়নেটের মুখে দেওয়া বিবৃতি

গ. গোয়েবলসের মতো বিবৃতি　　ঘ. বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের দেওয়া বিবৃতি

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসে বদি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। বদি ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য গেরিলা বাহিনীকে সংগঠিত করে। দেশ বিপদাপন্ন বলে সাধারণ পরিবারের সদস্যরা পরিবারকে জানিয়ে কিংবা না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যায়। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের প্রত্যাশা ছিল দেশ যেন তাড়াতাড়ি শত্রুমুক্ত হয়।

৩। উদ্দীপকের অনুভব 'একাত্তরের দিনগুলি'র যে দিকটিকে উন্মোচিত করেছে তা হচ্ছে–

i　রুমীর যুদ্ধে যাওয়া

ii　রুমীর বাবার উৎকণ্ঠা

iii　রুমীর মায়ের উৎকণ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. iii

৪। উদ্দীপকের অনুভবটি 'একাত্তরের দিনগুলি'র কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার চেষ্টা করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়

খ. যে কোনো প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে

গ. খুনি সরকারের কাছে রুমীর প্রাণ ভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা

ঘ. রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের জীবন বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল

সৃজনশীল প্রশ্ন

'স্বাধীন বাংলা বেতার'কেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে নেপথ্য ভূমিকা রেখেছিল। তারেক মাসুদ 'মুক্তির গান' প্রামাণ্যচিত্রে দেখিয়েছেন শিল্পীরা বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করছেন। যুদ্ধ কেবল মুক্তিযোদ্ধারা করেনি। এ যুদ্ধে শিল্পী, কলাকুশলী ও শব্দসৈনিকের ভূমিকাও ছিল।

ক. যুদ্ধের সময় জামী কোন শ্রেণির ছাত্র ছিল?

খ. 'নিয়াজীর আত্মসমর্পণ আনন্দের কিন্তু শরীফের কুলখানি বেদনার' কেন? বুঝিয়ে লিখ।

গ. উদ্দীপকের ভাবনা 'একাত্তরের দিনগুলি'র কোন দিককে উন্মোচিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের অনুভব 'একাত্তরের দিনগুলি'র সমগ্র অনুভবকে ধারণ করে কি? মূল্যায়ন কর।

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা

মমতাজউদদীন আহমদ

[**লেখক-পরিচিতি :** মমতাজউদদীন আহমদ ১৮ই জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট রামেশ্বরী ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ.(অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। কিছু সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মূলত নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিমান। বাংলাদেশের নাট্যশিল্প আন্দোলনের তিনি পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক: *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বকুলপুরের স্বাধীনতা, সাত ঘাটের কানাকড়ি;* তিনি বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। **২০১৯ সালের ২রা জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।**]

চরিত্র পরিচিতি

নূর মোহাম্মদ– দারোগা (বয়স ৪৫)
দলিলুর রহমান– পুলিশের সিপাহী (বয়স ২৫)
আব্দুল বারেক মণ্ডল– ঐ
লোক– (বয়স ৩৫)

[দৃশ্য পরিকল্পনা : বাংলাদেশের একটি ছোটো গঞ্জের নদীর ফেরিঘাট। রাত নয়টা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে]

দলিল : একটা পোস্টারের কাগজ এইটার বুকে সাঁটব?

বারেক : ছোটোবাবুকে বলি। স্যার একটা পোস্টার এই পিপেটাতে লাগিয়ে দিই।

দলিল : মাঝিমাল্লা আর ঘাটের রাহীদের নজরে পড়বে।

নূর : কিছু দেখছ, ভালো করে দ্যাখ। বদমায়েশটার পায়ের দাগ। কাঁচা মাটিতে দগদগ করছে।

দলিল : ফেরিঘাট তো স্যার। দিনেরাতে শয়ে শয়ে রাহী পারাপার করছে। আসামির পায়ের ছাপ নাও হতে পারে।

নূর : তুমি একটা বেকুব। আরো দশরকম পায়ের দাগ থাকতে আমি এই একটাকেই পয়েন্ট করলাম কেন? এটা সাধারণভাবে পা ফেলে হাঁটা নয়, সাবধানের সঙ্গে হাঁটা। দ্যাখো, এই লাইন ধরে নজর দাও। কী দেখছ? কোনটাতে সামনের আঙ্গুল ডেবে আছে, আর কোনটাতে গোড়ালি। আসামি সোজা পথে ঘাট দিয়ে নামেনি। হারামিটা আবার এই পথ দিয়েই ঘাটে আসবে।

বারেক : নাও তো ফিরতে পারে স্যার!

নূর : হ্যাঁ, নাও তো ফিরতে পারে, আবার ফিরতেও পারে। আমাদের কাজ হলো সন্দেহ হলেই থমকে দাঁড়াও, কুকুরের নাক দিয়ে শুঁকে দ্যাখ যদি কোনো সূত্র পাও। আমার সন্দেহ হয়, কুত্তার বাচ্চা এইখান দিয়েই নদীর ওপারে যাবে। যেতে হবে। ঘাটে নামার মতো আর কিনার নাই। আসামির দিলের দোস্তরা সময় মতো এই কিনার ধরে ডিঙি বল আর নৌকাই বল নিয়ে ঘুর ঘুর করবে আর ইশারা পেলেই ঘাটে ডিঙি লাগাবে আর ফুস করে পার হয়ে যাবে। এ তোমার মতো আহম্মক লোক নয়। ভিন কিসিমের মাল। মগজের পোড়ে পোড়ে বুদ্ধি। এ জায়গাটা ছাড়া যাবে না হে।

দলিল : আমাদের একটা পোস্টার এই কেরাসিন তেলের পিপেটার বুকে লাগিয়ে দেব স্যার।

নূর : কোথায়? হ্যাঁ লাগাও। আচ্ছাসে লেই দিয়ে কাঁচা রক্তের মতো সেঁটে দাও। দেশের মানুষ দেখুক।

দলিল : দু'হাজার টাকা পুরস্কার, কম হয়েছে স্যার।

নূর : কেন?

দলিল : দশ বিশ হাজার টাকার লোভেও ঐ লোকটাকে কেউ ধরিয়ে দিবে না। দেশের এত বড়ো একটা বিপ্লবী।

নূর : ওসব ভাবনা এখন বাতিল করে কাজে মেজাজ দাও। এইখানে আমি থাকলাম ডিউটিতে। দেখি তোমাদের নয়নের চাঁদ বিপ্লবীর বাচ্চা কী করে আজ রাতে ডিঙিতে ওঠে।

বারেক : আপনি একলাই থাকবেন?

নূর : আলবৎ। একাই থাকব। চব্বিশ বছর পুলিশের চাকরি করছি, আমাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তোমার ঐ বিপ্লবী দুলাভাই একটা মাছ-মারা জালুয়ার ছদ্মবেশ ধরে আসবে। ঘাড়ে জাল, হাতে হুক্কা। শালা, আয়, তুই থাকিস গাছের ডালে আর আমি থাকি তোর মগডালে।

দলিল : লোকটা খুব ধড়িবাজ। আমরাও আপনার সঙ্গে থাকি।

নূর : না।

বারেক : আমাদের কিন্তু সবদিকেই বিপদ।

নূর : মণ্ডল, তোমার কথাতে বদ গন্ধ ঢুকেছে। বুকে সাহস রেখে ইমানের সঙ্গে কাজ কর। আমরা হলাম হুকুমের টহলদার। আইন-আদালতের হেফাজতি পুলিশের ইমানের কাছে।

[বারেক এবং দলিল পোস্টার ও আঠা নিয়ে চলে গেল]

কে? কে যায়? এই শালা।

[একজন লোক লম্বা চুল। মুখে দাড়ি। গ্রামে গঞ্জে এ জাতের লোক পুঁথি কিস্সার গান গায়, কেতাব বিক্রি করে]

লোক : মালিক, ঘাটে যাব, নদ্দীর ওপারে হামার বাড়ি।

নূর : আর এক পা ফেলবি না। গুলি দিয়ে ঠ্যাঙ নুলা করে দিব।

লোক : ইয়া আল্লা! হামি মরে যাব যে! হামার জন্য কাঁদনের কেউ নাই সংসারে।

নূর : এই কাঁদিস না। কে তুই?

লোক : ফকির গরীবুল্লাহ হামার নাম।

নূর : এই ফকিরের বাচ্চা, ঘাটে নামিস না। গঞ্জের দিকে ফিরে যা।

লোক : ঘাটে নামিনি মালিক। এই পাড়ে বসে একটা গান ধরব, রসের গান। রসের গান শুনে মাঝিরা যদি দুটা একটা কেতাব কিনে লেয়, ভাত খাওয়ার পয়সা হয়ে গেল। তখন ধরেন যে এক শোয়াতে রাত ভোর করে দিনু।

নূর : আমি গানটান ভালোবাসি না।

লোক : না শুনলে ভালোবাসবেন কেমন করে হুজুর। বগাবগির গান মানে যে কলজে পানি করা গান;

[গাইন গাইছে : বগা ফান্দে পইড়া বগি কান্দেরে]

নূর : এই শালা বগার ভাতিজা।এই তোর গান? গানটার জান কবজ করে দিলি। যা ভাগ, ফিরে যা। এখানে আমার জরুরি কাজ আছে। তোর সঙ্গে বেহুদা কথা বলবার সময় নাই। আচ্ছা লোকটা দেখতে কেমন?

লোক : দেখিনি হুজুর।

নূর : বলবি না?

লোক : ইয়া আল্লা, মরে যাব যে মালিক। বলছি, হামাদের গাঁয়ে দেখছি।

নূর : দেখতে জোয়ান?

লোক : হ্যাঁ, তাগড়া জোয়ান, হানিফ পালোয়ানের মতোন সিনা। বাঘের মতোন লাল ঘোল্লা চোখের মণি। লাঠি, ছোরা, বন্দুক সব চালাতে জানে। আর হাতের কব্জি (পিপেতে ঘুষি মেরে) এই রকম লোহার মতোন শক্ত। একবার যদি হাত তুলে–

নূর : তার হাত আমি গুলি মেরে ভেঙে দিব।

লোক : খবরদার মালিক, খবরদার। ও কাজ ভুল করেও করতে যাবেন না হুজুর। একবার একটা জিদ্দি পুলিশ ডাকাতটাকে ধরতে গিয়েছিল, রাইফেল তুলে মারতে যাবে, ব্যস নাই। এক থাপ্পড়ে পুলিশের এই গালের হাড়ডি ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর করে পড়ে গেল।

নূর : তারপর?

লোক : তারপর আর কী হয়। পুলিশের রাইফেল হাতেই থাকল, এন্তেকাল এসে গেল।

নূর : দারোগা সাহেবও এন্তেকাল!

লোক : না না মালিক। কতক্ষণ কোরবানির কাটা গরুর মতোন ছটফট ছটফট করল,পা দুটা টান করল তারপর মানে যে যন্ত্রপাতি বন্ধ। এখন মানে যে একে আপনি কী বলবেন মালিক খতম, রোজকিয়ামত?

নূর : চুপ কর। এই লোকটা বেঁচে থাকলে দেশের আমলা পুলিশের জান বাঁচবে কী করে?

লোক : বাঁচবে না মালিক। এই লোক থাকলে জোদ্দার কি মালদারের বংশের আর গোরে মোমবাত্তি জ্বলবে না। হুজুর, আপনি তো ঘাটের এই ডাহিন দিকে নজর রেখেছেন লোকটা এপথে আসবে বলেই –

নূর : কেন?

লোক : না, মানে যে, ডাহিন দিকে তাকালে যদি বাঁদিক দিয়ে আসে।

নূর : তখন বাঁদিকে ঘুরে তাকাব!

লোক : ততক্ষণ কি সময় পাবেন মালিক। খোদা না খাস্তা, যদি আসেই, বাঘের মতোন লাফিয়ে আমার মালিকের ঘাড়ে–

নূর : তখন কী হবে গরীবুল্লাহ?

লোক : কী আর হবে মালিক। আপনি মানে যে শুয়ে পড়লেন কতক্ষণ বেদিশা হয়ে পড়ে থাকলেন, বাপদাদার নাম মনে করলেন, দেখলেন যে আসমান জমিন।

নূর : ভালো বলেছ গরীবুল্লাহ।

লোক : মালিক।

নূর : আল্লার রহমতে যদি ধরতে পারি, সরকারি বখশিশের ভাগ দাবি করবে?

লোক : না মালিক। হামি একটা সামান্য জীব। দেশের হাজার হাজার মানুষ হামার গান শুনে খুশি মনে দু'চার আনা পয়সা দেয়, ওতেই হামার দিন চলে যায়। হামি সরকারের পুরস্কার লিয়ে কি করব।

নূর : তুমি একটা ভালো মানুষের পয়দা হে গরীবুল্লাহ। ঈমান ঠিক রেখে বেঁচে থাক। তোমাদের মতো লোক দেখতে পাই না। চোর-ডাকাত দেখে দেখে পুলিশের রুহ্ পচে গেছে।

লোক : মালিকের উপরি আয়টায় হয় না কিছু?

নূর : হয়, কিন্তু নিই না। আমার বাপের কসম আছে। মাঝে মধ্যে মনটা খিচড়ে ওঠে, কী হবে মরা বাপের কথার মূল্য দিয়ে। কিন্তু বুকটা ধক্ ধক্ করে। এসব করি না বলেই তো চব্বিশ বছরে চাকরিতে প্রমোশন হলো না।

লোক : লোকটাকে ধরতে পারলে দু'হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। বড়ো মেয়ের বিয়া দিতে পারবেন।

নূর : ধরতে পারলে তো। তুমি যেসব কথা বলছ। লোকটা বুকভরা এত সাহস আর শক্তি কোথায় পায়। তুমি শালা বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না তো?

লোক : মালিক হামি গান বানাই ঠিকই, কিন্তু মানুষ বানাব কোন সাহসে। মানুষ তো বানায় দুনিয়ার সুরত

[গান : একূল ভাঙে ওকূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা]

নূর : গরীবুল্লাহ, এ তুমি কোন গান ধরলে। বুকটা হু হু করে ওঠে। বাংলার বাদশা পালিয়ে যাচ্ছে, বাংলা পরাধীন, গাও ভাই গাও।

[গান চলছে]

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, কে তাকে আশা দিবে, কে তাকে ভরসা দিবে, কেমন সুন্দর কথা, যতবার শুনি মনে হয় বুকের মধ্যে ধরে রাখি।

লোক : মালিক, হামাদের দেশ তো নদীর দেশ, সবুজ ধানের দেশ। তবুও হামরা এত দুঃখী কেন মালিক?

নূর : সব তকদিরের খেলা রে ভাই। কপালে দুঃখ থাকলে সুখ তো পাবে না।

লোক : হামি আর কী বলব। আপনার দুঃখ কেউ বুঝল না, হামার জ্বালা কেউ বুঝতে চায় না। হামাদের মগজের মধ্যে দিনরাত কিসব আলতুফালতু ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে হামাদের শক্তি কেড়ে নিচ্ছে, হামাদের সাহসকে গোর দিচ্ছে। আর এই সুযোগে যত সব জালেম আল্লার নাম ভাঙিয়ে হামাদের শরীল থেকে শোঁ শোঁ করে রক্ত শুষে লিয়ে বিদেশে পাচার করছে মালিক। আপনারা এসব বুঝতে পারেন না কেন?

নূর : তুমি শালা একটা উজবুক। বিড়াল হয়ে বাঘের মুখে থাপ্পড় দিতে চাও।

লোক : হামার বাপজান বলত, গরীবুল্লাহ, বেটা অনাহক যারা তাল ঠুকে, তারা খুব বড় কিসিমের গায়েন নয়। কথাটা ঠিক না বেঠিক একবার পরখ করবেন মালিক। হামাদের এই ভাঙা ফুটা শরীল নিয়ে তামাম মানুষ যদি এক জায়গাতে হাজির হতে পারতাম, একবার যদি জালেমের লোভের কব্জিতে দাঁত বসাতে পারতাম রক্তের নেশাতে গজরাতে পারতাম, তখন বুঝা যেত কারা বিলাই আর কারা বাঘ। যুদ্ধই তো হয় না মালিক, মরণ বাঁচার লড়াই। হামরা এই নদীর দেশের মানুষ একটা যুদ্ধ চাই মালিক, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ।

নূর : গরীবুল্লাহ তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে, এসব কথা বলো না।

লোক : সেই দুঃখই তো হামি চাহি মালিক। দুঃখের নদীতে আর কতকাল এমন করে ভাসব, তার চেয়ে উঠুক না কেন আসমান জুড়ে কালো ম্যাঘ, উথাল পাথাল ঢেউ, আর প্রলয় বাতাস

[গান : খরবায়ু বয় বেগে
চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো]

নূর : এই গরীবুল্লাহ, তুমি এ গান পেলে কোথায়? এ তো তোমার স্কুল-কলেজের গান। কিছু পড়ালেখা শিখেছ নাকি?

লোক : হামার গাঁয়ের একটা ছাত্র শহরে পড়ে, তার মুখে শুনেছি মালিক। সেই ছাত্র এখন জেলখানাতে বন্দি।

নূর : কিসের আসামি?

লোক : ঐ আপনার লাটসাহেবের মিটিং যে হলো, তার যে গণ্ডগোল, তারই মধ্যে ছিল।

নূর : বেকুবের মতোন এসব হুজ্জতের মধ্যে যায় কেন?

লোক : ও ছেলে মানে যে আগুন দিয়ে তৈরি, অন্যায় কথা সহ্য করতে পারে না। বললে বলে, গারদ ফাটক একদিন সব খান খান করে ভেঙে ফেলব। মালিক, আপনি তো ব্রিটিশ আমলের ছাত্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার মনটাতে হাহাকার করতো না।

নূর : করতো না কি গরীবুল্লাহ, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য কত কী করতাম। লাঠি চালাতাম, রক্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় এমন সব গান শিখতাম। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী, তুমি জান নাকি গানটা?

লোক : (গান) কলের বোমা তৈরি করে, দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে, লাট সাহেবকে মারব বলে, মারলাম স্বদেশবাসী।

নূর : সাবাস গরীবুল্লাহ, আবার গাও।

লোক : আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী।

নূর : ঐখানে গাও, চিনতে যদি না পারিস মা, দেখবি গলায় ফাঁসি।

[দু'জনে এক সঙ্গে গান গাইছে]

এসব বহুত পুরাতন কথা গরীবুল্লাহ, এখন যুগ জামানার ভিন্ন স্বাদ। দেশের মধ্যে নানান রকম কথাবার্তা শুরু হয়েছে। কখন যে কী হয়। এই চাকরি করলে কী হবে, বুঝি গরীবুল্লাহ, কিছু কিছু বুঝি। কিন্তু আমাদের হাত-পা যে বন্দি রে ভাই।

লোক : মালিক, একটা কথা ভাবছি আর মনে মনে হাসছি। যে লোকটাকে ধরবার জন্য আপনি এই আলো-আঁধারির রাতে ঘাট পাহারা দিচ্ছেন, ধরেন যে সেই লোকটা সত্যি সত্যি আপনার কাছে হাজির হলো। আপনি তাকে দেখছেন, সেও আপনাকে দেখছে। দেখতে দেখতে আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে– কে এই লোক? একে তো আমি চিনি, আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত, আমার বন্ধু। সে লোকটা আপনাকে বলছে– কী রে নূর মোহাম্মদ, কেমন আছিস? আমি মোয়াজ্জেম হোসেন,আমাকে ধরবার জন্য গাছে গাছে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়েছিস। আমাকে ধরলেই কি আগুন নিভে যাবে? স্বাধীনতার আগুন কখনো নেভে না। মালিক, আপনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন কি দেশের জন্য আপনাদের মন কাঁদত?

নূর : এখনো কাঁদে। যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালোবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালোবাসি গরীবুল্লাহ।

লোক : তাহলে আপনি আপনার বন্ধুকে ছেড়ে দিবেন না কেন মালিক?

নূর : তুমি আবার ঐ একই কথা বললে হে। বলছি তো আমার হাত-পা সব বন্দি। আমি পাহারাদার, আমি একটা বহুত দিনের পুরাতন যন্ত্র।

লোক : মালিক, হামরা যদি সেই যন্ত্রটাকে ভাঙতে বলি।

নূর : পারবে না, অসম্ভব।

লোক : কেন অসম্ভব?

নূর : চুপ কর। একটা ডিঙি আসছে। আমি জানতাম আসতেই হবে। আজ আমার ভাগ্যপরীক্ষা। জীবনের সঙ্গে লড়াই। বিপ্লবীকে ধরতে পারলে দু'হাজার টাকা পুরস্কার। আমার বড় মেয়ের ধুমধাম করে বিয়ে দিব।

লোক : (গান) আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ...

নূর : এই গরীবুল্লাহ, তোমার গান বন্ধ কর।

লোক : (গান) ছেলে-হারা শত মায়ের অশ্রু ...

নূর : শালা ফকিরের বাচ্চা, গান বন্ধ কর। তোমার গলা টিপে গানের চৌদ্দ পুরুষকে জবাই করব গরীবুল্লাহ।

[নদীর বুক থেকে এই গানের সুরে শিস আসছে, নূর মোহাম্মদ গরীবুল্লাহর গলা ছেড়ে দিয়েছে]

নূর : কে শিস দিল?

[গরীবুল্লাহ নদীর ঘাটে নামছে]

এই শালা ঘাটে নামিস না। ঘুরে দাঁড়া, গুলি করব।

[গরীবুল্লাহ ঘুরে দাঁড়াল]

কে তুমি? ঠিকমতো পরিচয় দাও। কে তুমি?

লোক : ফকির গরীবুল্লাহ মালিক। শাদুল্লা গায়েনের ব্যাটা।

নূর : ঝুট। মিথ্যা কথা বলো না। তুমি অন্য লোক।

লোক : অন্য কোন লোক? কে হতে পারি বলুন তো।

নূর : তুমি! আপনি কি সেই লোকটা, আসামি বিপ্লবী।

[লোকটি পরচুলা, দাড়ি আর টুপি খুলল]

লোক : মিলছে। চাপা মুখ, কালো চোখ, মাথার চুল ছোট, লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট। দু হাজার টাকার পুরস্কার। ডিঙিতে আমার বন্ধুরা শিস দিয়েছে ঠিক সময়ে। ঐ যে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠছে। এখন আমি যাব দারোগা সাহেব, যেতেই হবে, আমাদের জরুরি বৈঠক আছে।

নূর : আপনি যাবেন?

লোক : হ্যাঁ।

নূর : আমার তকদির। আপনার তো যাওয়া হবে না।

লোক : আপনি আমার বন্ধু। যেতে দিন।

নূর : না, নূর মোহাম্মদ দারোগা তোমাকে ছাড়বে না।

[লোকটি পিস্তল বের করেছে। নূর মোহাম্মদের হাতেও পিস্তল। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে]

লোক : স্বাধীনতার আগুন কখনো নেভে না।

নূর : কাছে এসো না গরীবুল্লাহ।

লোক : যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। যারা স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালোবাসি।

নূর : গরীবুল্লাহ, না। আর এগিয়ে এসো না।

লোক : [এগিয়ে আসছে। নূর মোহাম্মদ পিছোচ্ছে : গান ধরেছে]

নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা

নূর : তোমাকে আমি ছাড়ব না গরীবুল্লাহ, ডিউটি ইজ ডিউটি।

[পুলিশ দু'জন আসছে, তাদের কথা শোনা যাচ্ছে]

লোক : আমি ঐটার পিছনে বসে থাকব।

নূর : কেন?

লোক : পালাব না।

নূর : আহ্!

[লোকটি পিপেটার পিছনে লুকাল। পুলিশ দু'জন এসেছে]

দলিলুর রহমান, আব্দুল বারেক মণ্ডল। সব কাজ শেষ করেছ?

বারেক : ভালো করে সেঁটে দিয়েছি স্যার।

নূর : সাবাস। বিপ্লবী আর পালাতে পারবে না। দলিল, হারিকেনটা নিভিয়ে দাও।

দলিল : জ্বলুক স্যার। ঐ পিপেতে রেখে দিই।

নূর : আহ। দরকার হবে না। আকাশে চাঁদ উঠছে।

দলিল : এ চাঁদে আলো নাই স্যার।

নূর : এখন নাই, মাঝরাতে হবে। থানায় ফিরে যাও তোমরা।

বারেক : ফিরে যাব? কিন্তু আসামি?

নূর : আমি একলাই মোকাবিলা করব।

বারেক : স্যার, আসামি খুব জাঁহাবাজ।

নূর : হোক। এ্যাটেনশন, এ্যাবাউট টার্ন।

[পুলিশ দু'জন যান্ত্রিক নিয়মে চলে গেল,
হারিকেনটা জ্বলছে। লোকটি উঠে এল]

লোক : দারোগা সাহেব।
নূর : [হারিকেনটা তুলে নিয়েছে] অমন করে কী দেখছেন?
লোক : আমার পরচুলা আর টুপিটা। অনেক দূর যেতে হবে।
নূর : ঠিকমতো পরে নিন।

[লোকটি পরচুলা আর দাড়ি লাগাচ্ছে]

খুব সাবধান। আপনার চারদিকে দুশমন। পদে পদে বিপদ।

লোক : ঘরে ঘরে আমাদের বন্ধু।
নূর : আবার কখন দেখা হবে?
লোক : একদিন সকালে, যখন আকাশ জুড়ে প্রকাণ্ড লাল সূর্য উঠবে, অথবা এক রাত্রিতে, যখন আকাশ ভরে পূর্ণ চাঁদ হাসবে।

[দু'জনে আন্তরিক উষ্ণতায় করমর্দন করল]

নূর : আসুন।
লোক : হামার নাম ফকির গরীবুল্লাহ।
নূর : তুমি বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন, স্বাধীনতার সৈনিক।
[লোকটি নদীর ঘাটে নামছে]

[নদীর বুক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে গান উচ্চারিত হচ্ছে
আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
নূর মোহাম্মদ, আব্দুল বারেক, দলিলুর রহমান নীরবে দাঁড়িয়ে আছে] ❑

শব্দার্থ ও টীকা : গঞ্জ– ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান, হাট। **কৃষ্ণপক্ষ**– চান্দ্রমাসের যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। **রাহী**– পথচারী, পথিক; **নজরে**– দৃষ্টিতে; **বেকুব**– বেয়াকুব, বোকা। **ভিন কিসিমের মাল**– ভিন্ন বা অন্য রকমের মানুষ। **তেলের পিপে**– তেলের ড্রাম। **জালুয়া**– জেলে, ধীবর। **হুক্কা**– কাঁসা পিতল দস্তা বা মাটি অথবা নারকেল খোলে তৈরি একপ্রকার নলযুক্ত যন্ত্র যা তামাক খেতে বা ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয়। **ধড়িবাজ**– ফন্দিবাজ, প্রতারক। **টহলদার**– যে টহল দেয়, প্রহরী। **নুলা**– বিবশ, বিকল। **বেহুদা**– অনর্থক, বাজে। **রোজকিয়ামত**– মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিন, শেষ বিচারের দিন। **খাস্তা**– নষ্ট, পীড়িত, বিকৃত। **বেদিশা**– দিকভ্রষ্ট, দিশেহারা। **রুহ**– আত্মা, অন্তর। **তকদির**– ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল। **নাহক**– অযথা, খামখা, অনর্থক। **তামাম**– সমগ্র, সমস্ত, সমুদয়। **জালেম**– জুলুমকারী, অত্যাচারী। **গজরাতে**– আক্রোশে বা ভয়ে চাপা গর্জন করা। **হুজ্জত**– গোলমাল, হাঙ্গামা। **জামানা**– সময়, কাল, যুগ। **জাঁহাবাজ**– দুর্দান্ত, দজ্জাল। **এ্যাটেনশন**– সাবধান হও। **এ্যাবাউট টার্ন**– ঘুরে দাঁড়াও।

পাঠ-পরিচিতি : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *শতবর্ষের নাটক* নামক গ্রন্থ থেকে '*স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*' নাটিকাটি সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে। নাটিকাটি স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়। নাট্যকার এখানে আমাদের দেশের পুলিশ সদস্যদের মানবতাবোধ এবং দেশাত্মবোধ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দারোগা নূর মোহাম্মদ পুরস্কার ঘোষিত স্বদেশী আন্দোলনের

আসামিকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থপুরস্কারের লোভ জয় করে তিনি দেশের স্বাধীনতার ও বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। একজন দারোগা, দুজন পুলিশ সদস্য এবং একজন বিপ্লবীকে নিয়ে রচিত এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নাটকটি স্বদেশ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। শ্রেণিশিক্ষকের উপস্থিতিতে সবার অংশগ্রহণে পালাক্রমে নাটিকাটি অভিনয় করে দেখাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নূর মোহাম্মদ কাকে বেকুব বলেছিলেন?

ক. বারেককে খ. দলিলকে
গ. গরীবুল্লাহকে ঘ. মোয়াজ্জেম হোসেনকে

২। 'যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালোবাসি গরীবুলাহ'– পুলিশ কর্মকর্তার এ বক্তব্যে কী প্রকাশ পায়?

ক. সরকারের প্রতি আনুগত্য খ. গভীর দেশপ্রেম
গ. শাসকের কঠোরতা ঘ. দায়িত্বশীল আচরণ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে স্কুল মাস্টার গনি মিয়া গ্রামের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাধারণ জনতাকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ছদ্মবেশে থেকে নিজে সমগ্র বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।

৩। উদ্দীপকের গনি মিয়া 'স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা' নাটিকার যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো–

i নূর
ii বারেক
iii লোকটির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের গনি মিয়ার সঙ্গে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটিকার নূর মোহাম্মদ সাহেবের কোনটিতে সাদৃশ্য রয়েছে ?

ক. সততা খ. দেশপ্রেম
গ. সাহস ঘ. নেতৃত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এ দেশের গণমানুষকে জাগিয়ে তুলতে নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাঁরই নির্দেশে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাবে সফল হামলার পর ব্রিটিশ শাসকদের টনক নড়ে। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অর্থের লোভে জনৈক ব্যক্তি তার অবস্থান জানিয়ে দিলে তিনি ধরা পড়েন। অতঃপর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ক. 'রাহী' কথার অর্থ কী?

খ. 'আমাদের সবদিকেই বিপদ'–বারেক কেন এ কথা বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের সূর্যসেনের মাঝে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটিকার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "পরিণতি এক না হলেও সূর্যসেন ও 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটিকার বিপ্লবী ব্যক্তি যেন একসূত্রে গাঁথা"– যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

একুশের গল্প

জহির রায়হান

[**লেখক-পরিচিতি:** জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ শে আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। একজন ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে জহির রায়হান খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। চারপাশের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ- বেদনার চিত্র তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজের নানা বৈষম্য ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ। *হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, শেষ বিকেলের মেয়ে, আরেক ফাল্গুন* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার হিসেবেও জহির রায়হানের পরিচিতি রয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের অল্পকাল পরেই ১৯৭২ সালের ৩০ শে জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহিদ হন। তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি।]

তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবি নি কোনোদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে, চার বছর আগে যাকে হাইকোর্টের মোড়ে শেষবারের মতো দেখেছিলাম, যাকে জীবনে আর দেখবো বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি– সেই তপু ফিরে এসেছে। ও ফিরে আসার পর থেকে আমরা সবাই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। রাতে ভালো ঘুম হয় না। যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই। লেপের নিচে দেহটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।

দিনের বেলা ওকে ঘিরে আমরা ছোটখাটো জটলা পাকাই। খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে আসে ওকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। আমরা যে অবাক হই না তা নয়। আমাদের চোখেও বিস্ময় জাগে। দু'বছর ও আমাদের সাথে ছিল। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরও আমরা রাখতাম। সত্যি কি অবাক কাণ্ড দেখ তো, কে বলবে যে এ তপু। ওকে চেনাই যায় না। ওর মাকে ডাকো, আমি হলপ করে বলতে পারি, ওর মা-ও চিনতে পারবে না ওকে।

চিনবে কী করে? জটলার একপাশ থেকে রাহাত নিজের মত বলে, চেনার কোনো উপায় থাকলে তো চিনবে। এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আমরাও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি ক্ষণেকের জন্য। অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে রাহাতকে পাঠিয়েছিলাম, তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য।

সারাদিন এখানে সেখানে পইপই করে ঘুরে বিকেলে যখন রাহাত ফিরে এসে খবর দিলো, ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি তখন রীতিমতো ভাবনায় পড়লাম। এখন কী করা যায় বল তো, ওদের এক জনকেও পাওয়া গেল না? আমি চোখ তুলে তাকালাম রাহাতের দিকে।

বিছানার ওপর ধপাস করে বসে রাহাত বললো, ওর মা মারা গেছে। মারা গেছে? আহা সেবার এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কী কান্নাটিই না তপুর জন্যে কেঁদেছিলেন তিনি। ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। বউটার খবর?

ওর কথা বলো না আর। রাহাত মুখ বাঁকালো। অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে। সেকি! এর মধ্যে বিয়ে করে ফেললো মেয়েটা? তপু ওকে কত ভালোবাসতো। নাজিম বিড়বিড় করে বলে উঠলো চাপা স্বরে। সানু বললো, বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে নাকি মেয়েটা। বলে তপুর দিকে তাকালো সানু। আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর ওপর।

সত্যি, কে বলবে এ চার বছর আগেকার সেই তপু, যার মুখে এক ঝলক হাসি আঠার মতো লেগে থাকতো সব সময়, তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে কেন? দু'বছর সে আমাদের সাথে ছিলো। আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, তপু আর রাহাত।

তপু ছিলো আমাদের মাঝে সবার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কী হবে, ও-ই ছিলো একমাত্র বিবাহিত। কলেজে ভর্তি হবার বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু। সম্পর্কে মেয়েটা আত্মীয়া হতো ওর। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি, আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসতো এখানে। ও এলে আমরা চাঁদা তুলে চা আর মিষ্টি এনে খেতাম। আর গল্পগুজবে মেতে উঠতাম রীতিমতো। তপু ছিল গল্পের রাজা। যেমন হাসতে পারতো ছেলেটা, তেমনি গল্প করার ব্যাপারেও ছিল ওস্তাদ।

যখন ও গল্প করতে শুরু করতো, তখন কাউকে কথা বলার সুযোগ দিতো না। সেই যে লোকটার কথা তোমাদের বলেছিলাম না সেদিন। সেই হোঁৎকা মোটা লোকটা, ক্যাপিটালে যার সাথে আলাপ হয়েছিল, ওই যে, লোকটা বলছিল সে বার্নাড'শ হবে, পরশু রাতে মারা গেছে একটা ছ্যাকড়া গাড়ির তলায় পড়ে। ..... আর সেই মেয়েটা, যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো ...ও মারা যাবার পরের দিন এক বিলেতি সাহেবের সাথে পালিয়ে গেছে .... বুণী মেয়েটার খবর জানতো। সে কী, বুণীকে চিনতে পারছো না? শহরের সেরা নাচিয়ে ছিলো, আজকাল অবশ্য রাজনীতি করছে। সেদিন দেখা হলো রাস্তায়। আগে তো পাটকাঠি ছিলো। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। দেখা হতেই রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়ালো। বিয়ে করেছি শুনে জিজ্ঞেস করলো, বউ দেখতে কেমন হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ, কথা বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না। রাহাত থামিয়ে দিতে চেষ্টা করতো ওকে।

রেণু বলতো, আর বলবেন না, এত বক্‌তে পারে .....।
বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।
তবু থামতো না তপু। এক গাল হাসি ছড়িয়ে আবার পরম্পরাহীন কথার তুবড়ি ছোটাত সে, থাকগে অন্যের কথা যখন তোমরা শুনতে চাও না নিজের কথাই বলি। ভাবছি, ডাক্তারিটা পাশ করতে পারলে এ শহরে আর থাকবো না, গাঁয়ে চলে যাবো। ছোট্ট

একটা ঘর বাঁধবো সেখানে। আর, তোমরা দেখো, আমার ঘরে কোনো জাঁমজমক থাকবে না। একেবারে সাধারণ, হাঁ, একটা ছোট্ট ডিসপেনসারি আর কিছু না। মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত ছিল তপু।

এককালে মিলিটারিতে যাবার শখ ছিল ওর।

কিন্তু বরাত মন্দ। ছিলো জন্মখোঁড়া। ডান পা থেকে বাঁ পাটা ইঞ্চি দুয়েক ছোট ছিল ওর। তবে বাঁ জুতোর হিলটা একটু উঁচু করে তৈরি করায় দূর থেকে ওর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাটা চোখে পড়তো না সবার। আমাদের জীবনটা ছিলো যান্ত্রিক।

কাক-ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠতো সবার আগে। ও জাগাতো আমাদের দুজনকে, ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছো না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছো কেন, ওঠো। গায়ের উপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমাদের ঘুম ভাঙাতো তপু। মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিয়ে বলতো, দেখ বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরি করতো তপু। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আমরা বই খুলে বসতাম। তারপর দশটা নাগাদ স্নানাহার সেরে ক্লাশে যেতাম আমরা।

বিকেলটা কাটতো বেশ আমোদ-ফুর্তিতে। কোনোদিন ইস্কাটনে বেড়াতে যেতাম আমরা। কোনোদিন বুড়িগঙ্গার ওপারে। আর যেদিন রেণু আমাদের সাথে থাকতো, সেদিন আজিমপুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের ভেতর হারিয়ে যেতাম আমরা। রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড়মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। অপু বলতো, দেখো, রাহাত, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? কী?

এই যে আঁকাবাঁকা লালমাটির পথ, এ পথের যদি শেষ না হতো কোনোদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা। একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে? ভ্রু জোড়া কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করতো রাহাত। না, না, কবি হতে যাব কেন। ইতস্তত করে বলতো তপু। তবু কেন যেন মনে হয়..........।

স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন নাবতো তার। আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, তপু আর রাহাত। দিনগুলো বেশ কাট-ছিলো আমাদের। কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়লো। হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ানো মাঠটাতে অগুণিত লোকের ভীড় জমেছিলো সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়োরা এসে জমায়েত হয়েছিলো সেখানে। কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারো হাতে শ্লোগান দেবার চুঙ্গো, আবার কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলানো কয়েকটা রক্তাক্ত জামা। তর্জনী দিয়ে ওরা জামাগুলো দেখাচ্ছিলো, আর শুকনো ঠোঁট নেড়ে এলোমেলো আর কী যেন বলছিলো নিজেদের মধ্যে। তপু হাত ধরে টান দিলো আমায়, এসো। কোথায়? কেন, ওদের সাথে। চেয়ে দেখি, সমুদ্রগভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে। এসো। চলো। আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম। একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। যা ভেবেছিলাম, দৌড়ে এসে তপুর হাত চেপে ধরলো রেণু। কোথায় যাচ্ছ তুমি। বাড়ি চলো। পাগল নাকি, তপু হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বললো, তুমিও চলো না আমাদের সাথে। না, আমি যাবো না, বাড়ি চলো। রেণু আবার হাত ধরলো ওর। কী বাজে বকছেন। রাহাত রেগে উঠলো এবার। বাড়ি যেতে হয় আপনি যান। ও যাবে না। মুখটা ঘুরিয়ে রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক পলক তাকালো রেণু। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, দোহাই তোমার বাড়ি চলো। মা কাঁদছেন। বললাম তো যেতে পারবো না, যাও। হাতটা আবার ছাড়িয়ে নিলো তপু। রেণুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো। বললাম, কী ব্যাপার, আপনি এমন করছেন কেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি বাড়ি যান। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে টলটল চোখ নিয়ে ফিরে গেলো রেণু। মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে। তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।রাহাত শ্লোগান দিচ্ছিলো। আর তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্লাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্লাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।
তপু! রাহাত আর্তনাদ করে উঠলো।
আমি তখন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।
দুজন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মতো জমে গিয়েছিলো, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম, রাহাত পালাও।
কোথায়? হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো রাহাত।

তারপর উভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে। সে রাতে তপুর মা এসে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন এখানে। রেণুও এসেছিলো, পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিলো তার। কিন্তু আমাদের দিকে একবারও তাকায় নি সে। একটা কথাও আমাদের সাথে বলেনি রেণু। রাহাত শুধু আমার কানে ফিসফিস করে বলেছিলো, তপু না মরে আমি মরলেই ভালো হতো। কী অবাক কাণ্ড দেখ তো, পাশাপাশি ছিলাম আমরা। অথচ আমাদের কিছু হলো না, গুলি লাগলো কিনা তপুর কপালে কী অবাক কাণ্ড দেখ তো।

তারপর চারটে বছর কেটে গেছে। চার বছর পর তপুকে ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবি নি কোনোদিন। তপু মারা যাবার পর রেণু এসে একদিন মালপত্রগুলো সব নিয়ে গেলো ওর। দুটো স্যুটকেস, একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক, আর একটা বেডিং। সেদিনও মুখ ভার করে ছিলো রেণু।
কথা বলেনি আমাদের সাথে। শুধু রাহাতের দিকে একপলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, ওর একটা গরম কোট ছিলো না, কোটটা কোথায়? ও, ওটা আমার স্যুটকেসে। ধীরে কোটটা বের করে দিয়েছিলো রাহাত। এরপর দিন কয়েক তপুর সিটটা খালি পড়ে ছিলো। মাঝে মাঝে রাত শেষ হয়ে এলে আমাদের মনে হতো, কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে আমাদের।
ওঠো, আর ঘুমিও না, ওঠো।
চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু ওর শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠতো।
তারপর একদিন তপুর সিটে নতুন ছেলে এলো একটা। সে ছেলেটা বছর তিনেক ছিলো।
তারপর এলো আর একজন। আমাদের নতুন রুমমেট। বেশ হাসিখুশি ভরা মুখ।
সেদিন সকালে বিছানায় বসে, 'এনাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিলো সে। তার চৌকির নিচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনের' 'স্কাল'টা বের করে দেখছিলো আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ছিলো সে। তারপর এক সময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, রাহাত সাহেব, একটু দেখুন তো, আমার স্কালের কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন? কী বললে? চমকে উঠে উভয়েই তাকালাম ওর দিকে।
রাহাত উঠে গিয়ে স্কালটা তুলে নিলো হাতে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে। হাঁ, কপালের

মাঝখানটায় গোল একটা ফুটো, রাহাত তাকালো আমার দিকে, ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হলো না আমার।
বিড়বিড় করে বললাম, বাঁ পায়ের হাড়টা দু'ইঞ্চি ছোট ছিলো ওর।
কথাটা শেষ না হতেই বুড়ি থেকে হাড়গুলো তুলে নিলো রাহাত। হাতগুলো ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিলো ওর। একটু
পরে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বললো, বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দু'ইঞ্চি ছোট।
দেখো, দেখো।
উত্তেজনায় আমিও কাঁপছিলাম।
ক্ষণকাল পরে স্কালটা দুহাতে তুলে ধরে রাহাত বললো, তপু।
বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।

উদ্বিগ্ন–দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; উৎকণ্ঠিত; ব্যাকুল। **তন্দ্রা**– বিস্মর নিদ্রার আবেশ বা খোর; ঘুমের ঝোঁক; ঘুমঘুম ভাব। **বিস্ময়**– আশ্চর্য; চমৎকৃত ভাব। **ওস্তাদ**– গুরু; শিষ্য শিক্ষক্ষক। ভাব। **এনাটমি**– জীববিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র যা জীবদেহের গঠন সনাক্তকরণ এবং বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত। [ইংরেজি - Anatomy] **স্কেলিটন**– কঙ্কাল [ইংরেজি skeleton] **স্কাল**– মাথার খুলি [ইংরেজি skull]। **বার্নার্ডশ**– [ইংরেজি- George Bernard shaw একজন একজন আইরিশ নাট্যকার ও সমালোচক]

পাঠ-পরিচিতি

'*একুশের গল্প*'-শীর্ষক ছোটগল্পটি জহির রায়হানের *গল্প-সমগ্র* (১৯৭৯) থেকে সংকলন করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাণোচ্ছল ও স্বপ্নবান এক তরুণের আত্মত্যাগ। গল্পটিতে কথক নিজেও একটি চরিত্র; অর্থাৎ এ গল্পের ঘটনামালা উপস্থাপিত হয়েছে প্রথম পুরুষের বয়ানে। কথকের সমান্তরালে রাহাত ও তপু নামক আরও দুটি চরিত্রকে আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখি। মূলত এই তিন বন্ধুর আন্তরিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে ভাষা আন্দোলনকালীন বাংলাদেশের বাস্তবতা।

তপু 'একুশের গল্পে'র প্রধান চরিত্র। সে বিবাহিত; রেণু তার স্ত্রী। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধ মা। কিন্তু পারিবারিক সব পিছুটান উপেক্ষা করে প্ল্যাকার্ড হাতে তপু ছুটে যায় মিছিলে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার চাইতে গিয়ে ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয় সে। তপুর কপালের মাঝ বরাবর লেগেছিল গুলি। ছত্রভঙ্গ মিছিলের সামনে থেকে মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায় তার মৃতদেহ। ঘটনার ধারাবাহিকতায় চার বছর পর কলেজের হোস্টেলে একদিন আবিষ্কৃত হয় একটি কঙ্কাল। মাথার খুলির ফুটো আর বাম পায়ের টিবিয়া ফেবুলা দেখে বন্ধুরা বুঝতে পারে কঙ্কালটি প্রকৃতপক্ষে শহিদ তপুর। কেননা তার বাম পা ছিল ডান পায়ের চেয়ে দুই ইঞ্চি ছোট। তপুর মতো অনেক প্রাণের বিসর্জন এবং নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকার। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রধান প্রেরণা। 'একুশের গল্পে' তপুর কঙ্কাল হিসেবে ফিরে আসা যেন প্রতীকী অর্থ বহন করে। আমরা বুঝতে পারি, জাতীয় ইতিহাসে বীরদের কোনো মৃত্যু নেই; বারবার তাঁরা ফিরে আসে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রেরণা জোগায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। 'একুশের গল্প' রচনায় মিছিলে স্লোগান দিচ্ছিল কে?

ক. তপু খ. সানু

গ. রাহাত ঘ. রেণু

২। 'ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হলো না আমার।' এখানে 'চোখের ভাষা' বলতে বোঝানো হয়েছে-

ক. সমুদ্রগভীর জনতার মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান

খ. উর্ধ্বশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৌড়ে পালানোর কথা

গ. স্কেলিটনের স্কালটা তপুর সে বিষয়ে রাহাতের নিশ্চয়তা

ঘ. তপুর স্ত্রী রেণুর দ্বিতীয় বিয়ে করায় রাহাতের বিস্ময়

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কেউ না জানুক কার কারণে কেউ না জানুক কার স্মরণে মন পিছু টানে... তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে... তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে...

৩। কবিতাংশের 'মন পিছু টানা' 'একুশের গল্প' রচনার কোন দিকটি নির্দেশ করে?

ক. গল্পকথকের স্মৃতিকাতরতা
খ. ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলি
গ. বন্ধুত্বের নিবিড় অন্তরঙ্গতা
ঘ. তপুর অনাড়ম্বর জীবনের স্বপ্নভঙ্গ

৪। 'তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে'- 'একুশের গল্প' রচনায় এর প্রমাণ মেলে-

i . তপুর মায়ের মৃত্যুর ঘটনায়
ii . তপুর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিয়ে করায়
iii . তপুর বেডে নতুন ছেলে ওঠায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাগফার আহমেদ চৌধুরী আজাদ। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করা স্বাধীনচেতা, দুরন্ত, টগবগে এক তরুণ। ১৯৭১ সালে যোগ দিলেন ক্রাক প্লাটুনে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়াসহ বেশ কিছু অভিযানে সফলতা দেখালেন। কিন্তু ৩০ আগস্ট ধরা পড়লেন পাকবাহিনীর হাতে। সহযোদ্ধাদের তথ্য নেওয়ার জন্য তার উপরে চালানো হলো অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন। কিন্তু মুখ খুললেন না আজাদ, সব কিছু সহ্য করলেন দাঁতে দাঁত কামড়ে। তার মা সাফিয়া বেগম রমনা থানায় তার সাথে দেখা করতে এলে ভাত খেতে চেয়েছিলেন আজাদ। কিন্তু পরের দিন সাফিয়া বেগম ভাত নিয়ে গেলে ছেলেকে আর খুঁজে পাননি। ছেলেকে ভাত খাওয়াতে না পারার কষ্টে আজাদের মা সারা জীবন আর ভাত খাননি।

ক. গল্পকথকের সাথে তপুর শেষ দেখা হয়েছিল কোথায়?

খ. তপু ফিরে আসায় সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের আজাদের সাথে 'একুশের গল্প' রচনার কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. যুগে যুগে আজাদ, তপু, রাহাত, গল্প কথক- এঁরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায় কেন? উদ্দীপক ও 'একুশের গল্প' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

আমাদের সংস্কৃতি

আনিসুজ্জামান

[**লেখক-পরিচিতি :** আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. এবং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গবেষক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, পুরোনো বাংলা গদ্য*, ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদকসহ প্রচুর সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। **২০২০ সালের ১৪ই মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।**]

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য শিল্প নৃত্যগীতবাদ্য বুঝে থাকি। এগুলো সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ, তবে এগুলোই সংস্কৃতির সবটা নয়। সংস্কৃতি বলতে মুখ্যত দু'টো ব্যাপার বোঝায় : বস্তুগত সংস্কৃতি আর মানস-সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, আহারবিহার, জীবনযাপন প্রণালি– এসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর সাহিত্যে-দর্শনে শিল্পে-সংগীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বলা যায় মানস-সংস্কৃতি। বস্তুগত আর মানস-সংস্কৃতি মিলিয়েই কোনো দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছি, তা অনেক পুরানো। এই সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে মেলে, কিছু বৈশিষ্ট্য আলাদা করে শনাক্ত করা যায়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে, ধর্মানুপ্রেরণায়, বর্ণপ্রথায়, উৎপাদন-পদ্ধতির অনেকখানিতে বাঙালি সংস্কৃতির মিল পাওয়া যাবে গোটা উপমহাদেশের সঙ্গে। বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা– এই গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে। বাংলার অনেক রীতিনীতিরও মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেই এলাকায়। আবার ধান-তেল-হলদি-পান-সুপারির ব্যবহারে মিল পাওয়া যায় দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে। সেলাইছাড়া কাপড় পরার বিষয়েও বেশি মিল ঐ এলাকার সঙ্গে। এর কারণ, বাংলার আদি জনপ্রবাহ ছিল প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠীসম্ভূত। পরে এর ওপরে আর্য জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রভাব এসে পড়ে। সে প্রভাব এত তীব্র ছিল যে, তাই দেশজ উপকরণে পরিণত হয়। পরে মুসলমানরা যখন এদেশ জয় করলেন, তখন তাঁরা যে সংস্কৃতি নিয়ে এলেন, তাতে তুর্কি-আরব-ইরান-মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশেল ছিল। সেখান থেকে অনেক কিছু এল বাঙালি সংস্কৃতিতে। তারপর এদেশে যখন ইউরোপীয়রা এলেন, তখন তাঁরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ ঘটালেন আরো একটি সংস্কৃতির। এভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে অনেক সংস্কৃতি- প্রবাহের দান এসে মিশেছে। আর নানা উৎসের দানে আমাদের সংস্কৃতি হয়েছে পুষ্ট।

বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিতে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দরুন বাংলায় বিভিন্ন রাজত্ব যেমন স্থায়িত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি বাংলার এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ধর্মমতের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও উদ্ভাবন দেখা দিয়েছে। বাংলার সাহিত্য-সংগীতের

ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য গান ভিত্তি করে লেখা *মনসামঙ্গল* কাব্যের উদ্ভব পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে, পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ মাটিতে বিকাশ বৈষ্ণব পদাবলির। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালি গানের বিস্তার, শুষ্ক উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়ার, আর বাংলা পশ্চিমাঞ্চলে কীর্তন ও বাউলের। শিল্পসামগ্রীর লভ্যতাও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই বাংলার স্থাপত্যে পাথরের চেয়ে ইট আর মাটির প্রাধান্য, মৃৎফলক এখানকার অনন্য সৃষ্টি।

বাংলার ভাস্কর্যেও মাটির প্রাধান্য, আর সেই সঙ্গে দেখা যায় এক ধরনের সামগ্রীর ওপরে অন্য ধরনের সামগ্রীর উপযোগী শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস।

অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলার মানস-সংস্কৃতি প্রধানত আশ্রয় করেছে সাহিত্য ও সংগীত, অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনকে। স্বল্প হলেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাংলার দান আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিতের সাধনার তেমন ঐতিহ্য বাংলায় গড়ে ওঠেনি।

ফলিত বিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্রে– আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বাংলার একটা ভূমিকা ছিল, কিন্তু তাও ছিল সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল মূলত কারুশিল্পে। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই কারুশিল্প বিকশিত হলেও এর প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন হয়েছে ইংরেজ আমলে। তবে সে প্রযুক্তি বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে ধার করা।

বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে থাকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে। এই স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় শাসনব্যবস্থায়, সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও লিপির বিকাশ সে স্বাতন্ত্র্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। বহিরাগত মুসলমানরা এদেশ জয় করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে। মুসলমান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তার বিকাশে সহায়তা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মুঘলরা বাংলাদেশ জয় করেন। মুঘল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আগের মতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি, তবে একটা বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে তখন বাংলার সংস্কৃতির যোগ ঘটে। তারপর আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হলে যোগাযোগের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়; বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার যোগ সাধিত হয়।

ঐ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির কিছু কিছু ভেদ ছিল। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে ভেদটা খুব চোখে পড়ে। এর একটা ধারা ছিল উচ্চ শ্রেণির ভোগ্য– রুপোর কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, রেশমি ও উঁচু মানের সুতি কাপড়ের শিল্প; অন্য ধারাটা ছিল সাধারণের ভোগ্য– শাঁখের ও পিতলের কাজ, নকশীকাঁথা, পাটি, আলপনা। সমাজে উঁচু পর্যায়ে সংস্কৃত বা ফারসির যে-চর্চা হতো তা নিচু স্তরকে স্পর্শ করে নি। ধ্রুপদী সংগীত ও লোকসংগীত চর্চার মধ্যেও এমনি পার্থক্য ছিল। লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের ভেদও ছিল। তবে বাংলার সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজের প্রায় সকল স্তরকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল। এইজন্যে বাংলার মানস-সংস্কৃতিতে সবচেয়ে প্রাধান্য সাহিত্য ও সংগীতের।

ইংরেজ আমলে যে নতুন সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে, তার প্রেরণা এসেছিল প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে। পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগ ঘটেনি, তারা এর বিকাশে এবং এর উপভোগ্যতায়ও অংশ নিতে পারে নি। একালের সাহিত্য-সংগীত-নাটক-চিত্রকলা প্রধানত নগরের সৃষ্টি। এর অর্থ আমাদের মানস-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপ নির্মিত হয় উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিতের হাতে। ঔপনিবেশিক নয়, কিন্তু আগের মতোই শ্রেণিবিভক্ত। তাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সকলের অধিকার সমান নয় এবং এক শ্রেণির সৃষ্ট সংস্কৃতিতে অন্য শ্রেণির প্রবেশাধিকার নেই; আবার এক শ্রেণির সৃষ্ট সংস্কৃতি অন্য শ্রেণির পক্ষে রুচিকর নয়। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে এই অবস্থার কোনো বদল আশা করা যায় না।

আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিকে এক অর্থে ধর্মমুখী বলা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্য, ইসলাম ধর্মবিষয়ক রচনা বা নবিজীবনী, কীর্তন বা শ্যামাসংগীত তার উদাহরণ। এমনকি অধ্যাত্ম-তত্ত্বাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যানও এর মধ্যে ধরা যায়। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, বাংলার সাহিত্য ও সংগীতে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বক্তব্য একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মকলহের পাশাপাশি এক ধরনের সমন্বয়- চেতনা কাজ করেছে– যোগ ও সুফিবাদের সমন্বয় আর বাউল গান তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত, এর সবক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বস্তুর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানবিকতা। বৈষ্ণব কবিতা বা আধ্যাত্মিক প্রণয়কাহিনি তত্ত্বের চেয়ে প্রেমের কাহিনিরূপেই আদৃত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যে দেবতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষ। অবৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখেছেন, অমুসলমান কবি লিখেছেন কারবালা-কাহিনি।

এই মানবিকতাকে যদি বাঙালি সংস্কৃতির একটা মুখ্য প্রকাশ বলে গণ্য করি, তাহলে উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিতে সেই মানববাদের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করি। পুরানো ধারার সংস্কৃতিতে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ আছে। একালের সংস্কৃতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা সরবে শোনা যায়। এই দিক দিয়ে দেখলে আমাদের সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় মানবকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। আমাদের সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ নিয়ে যেমন আমরা গর্ব করতে পারি, তেমনি তার এই ভাববস্তুও আমাদের গৌরবের বিষয়। ❑

শব্দার্থ ও টীকা : প্রবৃত্তি- অভ্যাস, অভিরুচি। **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী**- পৃথিবীর ভাষাসমূহকে তাদের উৎপত্তি অনুসারে কয়েকটি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী অন্যতম। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি প্রধান ভাষাগুলো এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। **নৃ-তাত্ত্বিক**- জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত। **আর্য নরগোষ্ঠী**- প্রাচীন ইরাক-ইরান অঞ্চল থেকে আগত জনগোষ্ঠী। **মনসামঙ্গল**- মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস রচিত কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সাপের দেবী মনসার বন্দনা করা হয়েছে। **বৈষ্ণব পদাবলি**- মধ্যযুগে রচিত ভক্তিমূলক কবিতা। কবি জয়দেব বৈষ্ণব পদাবলির বিখ্যাত কবি। **আয়ুর্বেদ**- দেশজ চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ। **কারুশিল্প**- হস্তনির্মিত শিল্প যা একাধারে সুন্দর ও প্রাত্যহিক কাজে লাগে। **সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী**–৬০০-৭০০ শতাব্দী। **সুফিবাদ**– মুসলিম ধর্মীয় মতবাদ বিশেষ।

পাঠ-পরিচিতি : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের উৎসব (২০০৮)* গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধটি সংকলিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। আদিকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে বিশ্বের নানা জাতির সংস্কৃতি। এতে আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে, বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিকে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। আর তা হলো আমাদের লোকসংস্কৃতি। আমাদের সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, মাটির ভাস্কর্য, কারুশিল্প, বয়ন শিল্পের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। মূলত 'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে বাঙালি ও বাংলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ প্রবন্ধ আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মানবিকতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিদ্রোহী ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ অঞ্চলে যে ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ছিল– তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানস-সংস্কৃতির সঙ্গে কোনটি সম্পর্কযুক্ত নয়?

ক. সাহিত্য খ. সংগীত
গ. শিল্প ঘ. আহারবিহার

২। সংস্কৃতির দেশজ উপকরণ আহরণে যে জনগোষ্ঠীর প্রভাব অধিকতর, তা হলো–

i প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠী
ii আর্য জনগোষ্ঠী
iii ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীলগঞ্জ স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষা সফরে কুষ্টিয়া গেল। কুষ্টিয়া শহরের কাছেই ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়ায় গিয়ে তারা বাউল শিল্পীদের গান শুনল। লোকায়ত বাউল শিল্পীর মানবতাবাদী চেতনা তাদের মুগ্ধ করল। সেখান থেকে তারা শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে গেল। কুঠিবাড়ির ইটের কারুকার্য তাদের ভালো লাগল। কুঠিবাড়ির কাছেই শিলাইদহ ঘাট। তাদের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ বজরা করে এই ঘাট থেকেই পদ্মার বুকে ভেসে ভেসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সৃষ্টিশীলতায় মগ্ন থাকতেন।

৩। উদ্দীপকে 'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বিধৃত দিকটি হলো–

ক. বস্তুগত সংস্কৃতি খ. মানস সংস্কৃতি
গ. নগর সংস্কৃতি ঘ. বাউল সংস্কৃতি

৪। উদ্দীপকের অনুভূতির সাথে 'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের ভেদ আছে
খ. বাংলার সংস্কৃতিতে অনেক সংস্কৃতি-প্রবাহের দান এসে মিশেছে
গ. বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে
ঘ. উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির প্রভেদ আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাঙালি সংকর জাতি। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে এদেশের মানুষ একদিকে সহনশীল অন্যদিকে বিদ্রোহী। এ দেশের মানুষ নানা সঙ্কট মোকাবিলা করে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অভিযোজিত করেছে। এই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে নানা আয়োজন। শাসনশক্তির রূপান্তর, ধর্মান্তর প্রক্রিয়া এখন ইহজাগতিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বিলীন করেনি।

ক. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব কোথায়?
খ. উচ্চবর্গের সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের ভাবটি 'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধের কোন দিককে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বস্তুর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মানবিকতা' লেখকের এই অভিমত উদ্দীপকে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে – মূল্যায়ন কর।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

হায়াৎ মামুদ

[**লেখক-পরিচিতি :** হায়াৎ মামুদ ২রা জুলাই ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মৌড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হায়াৎ মামুদ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শেষে অবসর জীবনযাপন করছেন। কবিতা ও গল্প লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অর্ধশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : *স্বগত সংলাপ, প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী, নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী, বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, কিশোর বাংলা অভিধান* ইত্যাদি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।]

সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয়। আমরা সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য' বলি বটে, কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য, পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করি। সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বুঝে থাকি, যেমন– কবিতা, মহাকাব্য, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি। আর 'রীতি' হলো ঐ শাখাগুলো কীভাবে নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা।

কবিতা

ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ পদ্যে, যা লিখিত হয় তাকেই আমরা 'কবিতা' বলে থাকি। কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো– মহাকাব্য ও গীতিকবিতা। বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদ-বধ কাব্যে। মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে। ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনির একটি হলো *রামায়ণ* আর অন্যটি *মহাভারত*। *মহাভারত* সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে–'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে', এর অর্থ : *মহাভারত* গ্রন্থে যা নেই তা ভারতবর্ষেও নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না। *মহাভারত* আয়তনে বিশাল। *রামায়ণ* তার তুলনায় ক্ষুদ্র; কাহিনি হলো : পত্নী সীতাকে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস, তাঁদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; বনবাসে থাকার সময়ে লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণ তার বোন শূর্পণখার সম্মান রক্ষার জন্য সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগানবাড়িতে বন্দি করে রাখে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটিই রামায়ণ-কথা। অর্থাৎ এককথা, মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনি-কবিতা। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা, তবে তাকে গদ্যে না লিখে পদ্যে লিখতে হয়। এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা, যা 'গীতিকবিতা' হিসেবে পরিচিত।

গীতিকবিতা কবির অনুভূতির প্রকাশ হওয়ায় সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যদি দীর্ঘও হয় তাতেও অসুবিধে নেই, যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতাবলি।

নাটক

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মনে রাখা দরকার, নাটক সেকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে (তখন তো ছাপাখানা ছিল না) ঘরে ঘরে পঠিত হতো না, নাটক অভিনীত হতো। নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ। তার কারণ সাহিত্যের সকল শাখার ভিতরে নাটকই একমাত্র যা সরাসরি সমাজকে ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন। প্রাচীনকালে সে রকমই প্রথা ছিল। যেমন, শেক্সপিয়রও তাঁর সকল নাটক কবিতায় রচনা করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাব্য দুই ধরনের : দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য, সেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভবপর না হলে নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

নাটক সচরাচর পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত থাকে : ১. প্রারম্ভ, ২. প্রবাহ (অর্থাৎ কাহিনির অগ্রগতি), ৩. উৎকর্ষ বা Climax, ৪. গ্রন্থিমোচন (অর্থাৎ পরিণতির দিকে উত্তরণ), ৫. উপসংহার।

কাহিনীর বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটককে প্রধানত **ট্র্যাজেডি** (Tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক), **কমেডি** (Comedy বা মিলনান্ত নাটক) এবং প্রহসন (Farce)– এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যবেত্তা এরিস্টটল বলতে চেয়েছেন, রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনির দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্র্যাজেডি।

কমেডি বিষয়ে এরিস্টটলের বক্তব্য এ রকম : মানবচরিত্রের যে কৌতুকপ্রদ দিক কাউকে পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তা-ই কমেডির উপজীব্য। এই কৌতুকের জন্ম ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তিযোগের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের বা কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতির মধ্যে।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেলের লেখনীতেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসন বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়। তারপর দীনবন্ধু আবির্ভূত হন সামাজিক নাটক নিয়ে। তাঁর *নীলদর্পণ* নাটক এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ছোটোগল্প

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যা বলেছিলেন সে-কথাটি ছোটোগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। তিনি লিখেছিলেন :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

'শেষ হয়ে হইল না শেষ'–কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথার ভিতরেই বলে দেওয়া হলো যে, ছোটোগল্প কখনোই কাহিনির ভিতরে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেয় না– যেমনটা ঘটে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে 'ছোটোগল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বেশি নয়। তার পূর্বে শুধু 'গল্প' বলা হতো। বড়ো আকারের গল্প হলে 'উপন্যাসিকা' কথা চল ছিল, অর্থাৎ ছোট উপন্যাস। সাহিত্যের যত শাখা আছে, যেমন কাব্য মহাকাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদি, সে-সবের মধ্যে ছোটোগল্পই হচ্ছে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। ছোটোগল্পেও থাকে উপন্যাসের মতোই কোনো-না-কোনো কাহিনির বর্ণনা, তবে তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নয়, কাহিনির ভিতরে থেকেই বেছে নেওয়া কোনো অংশ থাকে মাত্র।

ইংরেজি সাহিত্যের উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলায় যেমন উপন্যাস লিখিত হয়েছে, ছোটগল্পেরও অনুপ্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই। 'ছোটোগল্প' বলতে কোন ধরনের কাহিনি বোঝাবে সে বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ছোটোগল্পকার এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) মনে করতেন আধ ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই 'ছোটোগল্প'।

বলাই বাহুল্য, উপন্যাসে যেমন বিস্তারিতভাবে কাহিনি বর্ণনা থাকে, ছোটোগল্পের পরিধি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন সেখানে সম্ভব নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বাংলা ভাষায় সার্থক ছোটোগল্পকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

উপন্যাস

সাহিত্যের শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। শুধু তাই নয়, পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে এবং কাহিনিটি গদ্যে লিখিত হয়। কিন্তু পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন কাহিনি পদ্যে লেখা হতো; তখন অবশ্য তাকে উপন্যাস বলা হত না। যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সব ধরনের মঙ্গলকাব্যই ছন্দে রচিত এবং তাতে গল্প বা কাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে, তবু তাকে উপন্যাস না বলে কাব্যই বলা হতো–যেহেতু

কবিতার ন্যায় তা ছন্দে রচিত হয়েছে। উপন্যাস রচিত হয় গদ্যভাষায়, এই তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দোবদ্ধ রচনার অনেক পরে যেহেতু গদ্যের আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গদ্যে কাহিনী লেখা হয়েছে, যেমন– গল্প বা ছোটোগল্প, উপন্যাস, রম্যকাহিনি ইত্যাদি। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট (Plot)। ঐ প্লট বা আখ্যানভাগ তৈরি হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভিতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ও কালজয়ী (এবং অনেকের মতে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিম উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি কালজয়ী কথাসাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝি।

উপন্যাস বহু রকমের হতে পারে। যেমন– ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, মনোবিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব জনপ্রিয় ছিল।

প্রবন্ধ

আমরা সকলেই অস্পষ্টভাবে বুঝি 'প্রবন্ধ' কাকে বলে বা কী রকম। গদ্যে লিখিত এমন রচনা যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। কোনো সন্দেহ নেই, এ জাতীয় লেখায় তথ্যের প্রাধান্য থাকবে যার ফলে অজ্ঞাত তথ্যাদি পাঠক জানতে পারবে। ধরা যাক, সংবাদপত্রের যাবতীয় খবরাখবর-দেশের, বিদেশের, মহাকাশের ইত্যাদি। সবই গদ্য ভাষায় রচিত এবং যার লক্ষ্য পাঠকের অজানা বিষয় পাঠককে জানানো। গদ্যসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও তথ্যবহুল রচনা হলেই তাকে প্রবন্ধসাহিত্যের উদাহরণরূপে গণ্য করা চলবে না, যদি-না লেখাটি সাহিত্য পদবাচ্য হয়। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা। লেখকের সৃজনীশক্তির কোনো পরিচয় যদি পরিস্ফুটিত না হয়, তো তেমন কোনো লেখাকে প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে না। এ-কারণে খবরের কাগজে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই গদ্যে রচিত হলেও তাদেরকে প্রবন্ধসাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। তাহলে তো জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল রচনাই প্রবন্ধসাহিত্য বলে গণ্য হতে পারত। তা না হওয়ার কারণ ঐ সৃজনশীলতার অভাব।

মনে রাখা প্রয়োজন : সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য– সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধের সেই একই উদ্দেশ্য। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করা হয়।

প্রবন্ধের দুটি মুখ্য শ্রেণিবিভাগ আছে : তন্ময় (objective) প্রবন্ধ ও মন্ময় (subjective) প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে-সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় সেগুলোকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তাপ্রধান সৃষ্টি। এ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

আরেক শ্রেণির রচনাও সম্ভব যেখানে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। এদেরকে মন্ময় প্রবন্ধ বলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্যায়ের। ফরাসি ভাষায় বেল্ লেৎর্ (belle letre) বলে একটি শব্দ আছে, ইংরেজিতেও বেল্ লেৎর্ই বলে। এর বাংলা নেই। বাংলায় বলা যেতে পারে চারুকথন। বেল্ শব্দের অর্থ–সুন্দর, চমৎকার। আর লেৎর্ অর্থ– letter, অক্ষর। বেল্ লেৎর্ মন্ময় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির সকল রচনাই এ জাতীয় মন্ময় প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। অনেকে এ ধরনের লেখাকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলারও পক্ষপাতী। 'রম্য রচনা' নামে একটা কথা অনেক দিন যাবত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বোঝাতে চালু হলেও দুটি একজাতীয় লেখা নয়। বেল্-লেৎর্ বোঝাতে 'রম্য রচনা' ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ 'রম্য রচনা' শব্দদ্বয়ের 'রম্য' শব্দের ভিতরে এমন ইঙ্গিত রয়ে যায় যে, লেখাটি সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে নয়, অথচ রম্যরচনার বিষয় খুবই গুরুগম্ভীর হতে পারে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা গুরুগম্ভীর হলে চলবে না।

শব্দার্থ ও টীকা : মেঘনাদ-বধ কাব্য– কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। **রামায়ণ**– প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। **মহাভারত**– প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। **যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে**– যা মহাভারতে নেই তা ভারতবর্ষের কোথাও নেই– এমন বোঝানো হয়েছে। **লঙ্কা দ্বীপ**– সিংহল দ্বীপ, বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। **অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)**– জন্ম ঢাকায় ১৮৭১-এর ২০শে অক্টোবর এবং মৃত্যু লখ্নৌ শহরে ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগস্ট। ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। সংগীত রচনার জন্য বাঙালির সংস্কৃতিজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গান অদ্যাবধি জনপ্রিয়। **অরূপরতন**– রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক। **এইচ. জি. ওয়েল্স্ (১৮৬৬-১৯৪৬) :** ইংরেজি ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর স্রষ্টা। **একাঙ্কিকা**– এক অঙ্কের নাটককে বলা হয়। **এড্গার্ অ্যালান পো** (১৮০৯-৪৯)– আমেরিকার কবি, গল্পকার ও সমালোচক। **এরিস্টট্ল্ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ)**– গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। **কপালকুণ্ডলা**– উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস, উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে নায়িকার নামে। **কালাপাহাড়**–একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। হিন্দুধর্মবিদ্বেষী এক সেনাপতি, দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। **গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)**– বাংলা নাটকের যুগন্ধর পুরুষ। নাট্যরচনার পাশাপাশি অভিনয়ও

করতেন। অভিনেতা হিসেবেও অভূতপূর্ব সুনাম অর্জন করেছিলেন। **চন্দ্রগুপ্ত**– প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নৃপতি, রাজত্বকাল ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দ, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) বিখ্যাত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। **চন্দ্রশেখর**– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস; **জনা**– পৌরাণিক নাটক। **ডাকঘর**– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)** : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। **দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)**– কবি, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতা, তাঁর 'শাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক; **দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০- ৭৩)**– বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা লেখক, 'নীলদর্পণ' তাঁর সর্বাধিক খ্যাত নাটক, ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, 'সধবার একাদশী' তাঁর বিখ্যাত প্রহসন। **রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)**– সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। **রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)**– কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বাঙালি কমিশনার। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস; **রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)**– পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের শিল্পী। বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, গৌড়ীয় ব্যাকরণ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। **সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)**– আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। **দৃশ্যকাব্য**– প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়ে থাকে। **নকশীকাঁথার মাঠ**– পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত আখ্যান কাব্য। **নীলদর্পণ**– দীনবন্ধু মিত্রের নাটক, দেশের তৎকালীন শাসনকর্তা ব্রিটিশদের হুকুমে বাধ্যতামূলক নীলচাষ করানোর সমালোচনা করে এই নাটক রচিত হয়েছিল। **পৌরাণিক নাটক**– ভারতবর্ষীয় পুরাণের কোনো কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। **প্রফুল্ল**– নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা নাটক। **প্রহসন**– উপন্যাস বা নাটকের রচনাশৈলী অবলম্বনে হাস্যরসাত্মক রচনা। **প্লট**– গল্প উপন্যাস নাটকের কাহিনী অংশকে প্লট বলা হয়। **বনফুল**– গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বা লেখক নাম। **বন্দে মাতরম**– এই দু শব্দের অর্থ জননীকে অর্থাৎ মাকে বন্দনা করি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে স্বরচিত এই গানটি যুক্ত করেছেন। **বিচিত্র প্রবন্ধ**– রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। **বিষবৃক্ষ**– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। **বুদ্ধদেব**– পৌরাণিক নাটক। **বৈষ্ণব কবিতা**– প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিকবিতা ও গান। **মঙ্গলকাব্য**– বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত এক ধরনের কাহিনি-কাব্য। **মহাভারত**– প্রাচীন ভারতবর্ষে দুটি মহাকাব্যের একটি, অন্যটি রামায়ণ, মূল রচনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, অনেক পরে বাংলায় অনূদিত হয়। **মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত**–উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস **মাধবীকঙ্কণ**– রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত উপন্যাস। **রক্তকরবী**– রবীন্দ্রনাথ রচিত সাংকেতিক নাটক **রাজপুত জীবনসন্ধ্যা**– রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। **রামপ্রসাদ সেন (আনু: ১৭২৩-৮১)** কবি ও সংগীত রচয়িতা, ভক্তিগীতি রচনার জন্য বিখ্যাত, এঁর গানকে 'রামপ্রসাদী' আখ্যা দেওয়া হয়। **শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১)**– ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহিদ হন। **শাজাহান**– নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

রায় রচিত নাটক। **শূর্পণখা–** রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনিতে লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। **শেক্সপিয়র–** (১৫৬৪-১৬১৬) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। **শ্রব্যকাব্য–** যে কাব্য পড়া ও শোনার জন্য রচিত, এর বিপরীতে রয়েছে দৃশ্যকাব্য; **সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ–** প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পুরানো আমলে যাঁরা আলোচনা করেছেন, বইপত্র লিখেছেন। **সীতা–**পৌরাণিক চরিত্র, রামচন্দ্রের স্ত্রী, লঙ্কার রাজা রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণের বিরুদ্ধে রাম যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'সীতা' ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। **সোজনবাদিয়ার ঘাট–** পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত কাহিনীকাব্য। **হাসান আজিজুল হক–** জন্ম ১৯৩৯ সালে, বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাশিল্পী।

পাঠ-পরিচিতি : সাহিত্য নানা ধরনের। অনেক রকম উদ্ভিদ নিয়ে যেমন বাগান তেমনি বিভিন্ন রকম সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সাহিত্য। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে বিচিত্র সাহিত্যরীতির পরিচয় আছে। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যের জগৎ। আবার প্রত্যেকটির কিছু শাখা-প্রশাখা আছে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের এই সব রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা, নাটক, ছোটোগল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি উপ-শিরোনামে লেখক প্রত্যেকটি রীতির স্বরূপ চারিত্র্য তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি মূলত বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের আলোকে সাহিত্যের রূপ, রীতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পাঠে আমাদের উৎসাহিত করে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। বাম পাশে সাহিত্যের বিভিন্নশাখা ও ডান পাশে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

২। তুমি নিজে (স্বরচিত) একটি কবিতা লিখে শিক্ষককে দাও।

৩। নিজেদের লেখায় সমৃদ্ধ একটি 'দেয়ালিকা' প্রকাশ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'– মন্তব্যটি কোনটি সম্পর্কে?

ক. গীতিকবিতা খ. ছোটোগল্প
গ. মহাকাব্য ঘ. কাহিনিকাব্য

২। 'পাঠক সমাজে উপন্যাস সাহিত্য বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়' কারণ উপন্যাস–

i সহজ-সরল-প্রাঞ্জল
ii পাঠক নিজেকে খুঁজে পায়
iii এখানে সমাজ দেশ ও জাতির প্রতিফলন ঘটে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। 'গল্পপাঠ শেষ করেও পাঠক কাহিনির সমাপ্তি খোঁজে' বক্তব্যটি ধারণ করে যে পঙ্‌ক্তি–

i ঘটনার ঘনঘটা
ii শেষ হয়ে হইল না শেষ
iii অন্তরে অতৃপ্তি রবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। জীবনের পূর্ণাবয়ব নয়, খণ্ডাংশকে লেখক রস-নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে– স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে এর পরিণতি ঘটে।

উদ্দীপকে সাহিত্যের কোন শাখার পরিচয় ফুটে উঠেছে?

ক. কবিতা খ. ছোটোগল্প
গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাহিনির উৎস পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা, আয়তনে বিশাল। কাহিনি বিভিন্ন সর্গে বা পর্বে বিভক্ত থাকে, সাধারণত পদ্যে রচিত হয় তবে গদ্যেও হতে পারে। এর নায়ক হবে বীর, প্রভাবশালী, আপসহীন দৃঢ়চেতা। কাহিনির উত্থান-পতন থাকবে।

ক. সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি?
খ. নাটককে দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'সাহিত্যে রূপ ও রীতি' রচনার সাহিত্যের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই সাহিত্যের একমাত্র দিক নয় বরং এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

বাঙলা শব্দ

হুমায়ুন আজাদ

[লেখক-পরিচিতি : বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক ও কবি হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ সালের ২৮শে এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ুন আজাদ দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : কাব্য– *অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু;* উপন্যাস– *ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, সব কিছু ভেঙে পড়ে,* গল্প– *যাদুকরের মৃত্যু,* প্রবন্ধ– *নিবিড় নীলিমা, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, বাক্যতত্ত্ব, লাল নীল দীপাবলি, কতো নদী সরোবর* ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অন্যান্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ সালের ১২ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।]

বাংলা ভাষার একরকম শব্দকে বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ'। আরেক রকম শব্দকে বলা 'তৎসম শব্দ'। এবং আরেক রকম শব্দকে বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। এ-তিন রকম শব্দ মিলে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শরীর। 'তৎসম', 'তদ্ভব' পারিভাষিক শব্দগুলো চালু করেছিলেন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা। তাঁরা 'তৎ' অর্থাৎ 'তা' বলতে বোঝাতেন 'সংস্কৃত' (এখন বলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য) ভাষাকে। আর 'ভব' শব্দের অর্থ 'জাত, উৎপন্ন'। তাই 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো 'সংস্কৃত থেকে জন্ম নেওয়া', আর 'তৎসম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সংস্কৃতের সমান' অর্থাৎ সংস্কৃত। বাংলা ভাষার শব্দের শতকরা বায়ান্নটি শব্দ 'তদ্ভব' ও অর্ধ-তৎসম'। শতকরা চুয়াল্লিশটি 'তৎসম'। তাই বাংলা ভাষার শতকরা ছিয়ানব্বইটিই মৌলিক বা বাংলা শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার-বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের স্রোতে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাংলা শব্দে। এগুলোই তদ্ভব শব্দ। এ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাংলা ভাষা। তবে তদ্ভব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসেনি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই এসেছে বেশি সংখ্যক শব্দ।

'চাঁদ', 'মাছ', 'এয়ো', 'দুধ' 'বাঁশি'। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নিয়ম মেনে প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে এসেছে বাংলায়। 'চাঁদ' ছিল সংস্কৃতে 'চন্দ্র', প্রাকৃতে ছিল 'চন্দ'। বাংলায় 'চাঁদ। 'মাছ' ছিল 'মৎস্য' সংস্কৃতে, প্রাকৃতে হয় 'মচ্ছ'। বাংলায় 'মাছ'। 'এয়ো' ছিল সংস্কৃতে 'অবিধবা'। প্রাকৃতে হয় 'অবিহবা'। বাংলায় 'এয়ো'। 'দুধ' ছিল সংস্কৃতে 'দুগ্ধ'; প্রাকৃতে হয় 'দুদ্ধ'। বাংলায় হয় 'দুধ'। 'বাঁশি ছিল 'বংশী' সংস্কৃতে। প্রাকৃতে হয় 'বংসী'। বাংলায় 'বাঁশি'। বেশ নিয়ম মেনে, অনেক শতক পথ হেঁটে এসেছে এ-তীর্থযাত্রীরা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা।

আরো আছে কিছু তীর্থযাত্রী, যারা পথ হেঁটেছে আরো বেশি। তারা অন্য ভাষার। তারা প্রথমে ঢুকেছে সংস্কৃতে, তারপর প্রাকৃতে। তারপর এসেছে বাংলায়। এরাও তদ্ভব শব্দ। মিশে আছে বাংলা ভাষায়।

'খাল' আর 'ঘড়া'। খুব নিকট শব্দ আমাদের। 'খাল' শব্দটি তামিল ভাষার 'কাল' থেকে এসেছে। 'কাল' সংস্কৃতে হয় 'খল্ল'। প্রাকৃতে হয় 'খল্ল'। বাংলায় 'খাল'। তামিল-মলয়ালি ভাষায় একটি শব্দ ছিল 'কুটম'। সংস্কৃতে সেটি হয় ঘট। প্রাকৃতে হয় 'ঘড়'। বাংলায় 'ঘড়া'।

'দাম' আর 'সুড়ঙ্গ'। প্রতিদিনের শব্দ আমাদের। 'দাম' শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার 'দ্রাখ্মে' (একরকম মুদ্রা, টাকা) থেকে। 'দ্রাখ্মে' সংস্কৃতে হয় 'দ্রম্য'। প্রাকৃতে 'দম্ম'। বাংলায় 'দাম'। গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ ছিল 'সুরিংক্স্'। শব্দটি সংস্কৃতে ঢুকে হয়ে যায় 'সরঙ্গ'/'সুরুঙ্গ'। প্রাকৃতেও এভাবেই থাকে। বাংলায় হয়ে যায় 'সুড়ঙ্গ'।

'ঠাকুর'। বাংলায় শ্রেষ্ঠ কবির নামের অংশ। শব্দটি ছিল তুর্কি ভাষায় 'তিগির'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে হয়ে যায় 'ঠক্কুর'। বাংলায় 'ঠাকুর'।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষয় অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাংলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। বাংলা ভাষায় এমন শব্দ অনেক। তবে এ-শব্দগুলো যে একেবারে বদলায়নি, তাও নয়। এদের অনেকে পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা সে-পরিবর্তিত রূপগুলোকে বাদ দিয়ে আবার খুঁজে এনেছি খাঁটি সংস্কৃত রূপ।

জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, দর্শন, দৃষ্টি, বংশী, চন্দ্র এমন শব্দ। এদের মধ্যে 'বংশী' ও 'চন্দ্র'র তদ্ভব রূপও আছে বাংলায়। 'বাঁশি' আর 'চাঁদ'। পুরানো বাংলায় 'সসহর' ছিল, 'রএণি' ছিল। এখন নেই। এখন আছে সংস্কৃত শব্দ 'শশধর' আর 'রজনী'। বাংলা ভাষার জন্মের কালেই প্রবলভাবে বাংলায় ঢুকতে থাকে তৎসম শব্দ। দিন দিন তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে তৎসম শব্দ বাংলা ভাষাকে পরিণত করে তার রাজ্যে।

কিছু রুগ্ণ শব্দ এসেছে বাংলায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতের কিছু শব্দ কিছুটা রূপ বদলে ঢুকেছিল প্রাকৃতে। তারপর আর তাদের বদল ঘটেনি। প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে সেগুলো এসেছে বাংলায়। এগুলোকেই বলা হয় অর্ধ-তৎসম। 'কৃষ্ণ' ও 'রাত্রি' বিকল হয়ে জন্মেছে 'কেষ্ট' ও 'রাত্তির'। শব্দগুলো বিকলাঙ্গ। মার্জিত পরিবেশে সাধারণত অর্ধ-তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূল নির্ণয় করতে পারেননি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয় যে বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে যেসব ভাষা ছিল আমাদের দেশে, সেসব ভাষা থেকে এসেছে ওই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় 'দেশি' শব্দ। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতোই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকেও গ্রহণ করা উচিত বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী করে বিদেশি বলি ? ❑

শব্দার্থ ও টীকা : তদ্ভব শব্দ– তা থেকে উৎপন্ন, প্রাকৃত বাংলা শব্দ, এই শব্দগুলো প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ক্রম পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে **তৎসম শব্দ**– তৎসদৃশ, তদ্রূপ, সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ। **অর্ধ-তৎসম শব্দ**– অর্ধেক তার সমান, তৎসম শব্দের আংশিক পরিবর্তিত রূপ। **প্রাকৃত**– প্রকৃতিজাত, স্বাভাবিক, প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার রূপান্তর বিশেষ। **এ-তীর্থযাত্রীরা**– এখানে বাংলা ভাষায় আগত শব্দভাণ্ডারকে বোঝানো হয়েছে। **আমাদের**

সবচেয়ে প্রিয়রা– বাংলা ভাষায় আগত শব্দসমূহ আমাদের বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ কারণে আগত শব্দসমূহকে লেখক সবচেয়ে প্রিয় বলে বিশেষায়িত করেছেন। **অবিকশিতভাবে–** বিকশিত নয়, এমন। **বিকলাঙ্গ–** ত্রুটিযুক্ত অঙ্গ।

পাঠ-পরিচিতি : হুমায়ুন আজাদের *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* নামক গ্রন্থ থেকে বাঙলা শব্দ প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে যে প্রচলিত পাঁচটি ভাগ করা হয়েছে তার তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দ নিয়েই প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় এসে বাংলা-ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে– তা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটি মূলত বাংলা শব্দের উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি ভাষাসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার জানা দশটি আঞ্চলিক শব্দ ও তার আধুনিক বাংলা রূপ লিখ।

২। পাঁচটি করে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাঙলা ভাষার শতকরা কতটি শব্দ মৌলিক বা বাংলা শব্দ?

ক. ৫২টি খ. ৪৪টি
গ. ৯৬টি ঘ. ৯৮টি

২। 'কেষ্ট' ও 'রঙিন' এ শব্দ দুটোকে বিকলাঙ্গ বলা হয় কেন?

ক. এ দুটো সংস্কৃত শব্দ
খ. এ দুটো প্রাকৃতের অবিকশিত রূপ
গ. এ দুটো তদ্ভব শব্দ বলে
ঘ. এ দুটোর উৎস অজ্ঞাত বলে

৩। চন্দ্র > চন্দ – কোন শব্দের উদাহরণ?

ক. তৎসম খ. অর্ধ-তৎসম
গ. তদ্ভব ঘ. দেশি

সৃজনশীল প্রশ্ন

মোহিত স্যার ক্লাসে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বাংলা হলো সংস্কৃতের মেয়ে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। এ বিষয়ে কৌতূহলী বেশ কিছু শিক্ষার্থী শেকড়ের সন্ধানে গিয়ে দেখে যে, শুধু সংস্কৃত নয় বরং বিভিন্ন ভাষার শব্দ পরিবর্তিত, আংশিক পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত রূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার ভিত। তাই তারা মনে করে সংস্কৃতের সাথে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের মেয়ে বলা যায় না।

ক. 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাংলা ভাষা' লেখকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

গ. উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানে উন্মোচিত বাংলা ভাষার শব্দের গতিপথ 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে মোহিত স্যারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

আমাদের নতুন গৌরবগাথা

আসছে ফাগুনে আমরা দ্বিগুণ হবো—বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে ছড়ানো অগুনতি গ্রাফিতি। কিন্তু এ কোনো ফাগুনের দিন ছিল না, ছিল না রৌদ্রদহনের কোনো কাল। ছিল বাংলার নিজস্ব ঋতু—বর্ষা। অবিরাম ঝরছিল, মাটি-প্রকৃতি সব শীতল করছিল। কিন্তু আঠারো কোটি মানুষের মনে জ্বলতে থাকা আগুন থামানোর সাধ্য তার ছিল না।

সেদিন ৫ই আগস্ট ২০২৪—৩৬শে জুলাই। বাংলাদেশের ক্যালেন্ডার জুলাইয়ে থেমে গেছে। এদেশের আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটনের চিরাচরিত কোনো সময় এটা নয়। তবু সমগ্র দেশ যেন এক অসহনীয় উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে আছে। শুধু দেশ নয়, সারা দুনিয়ার মানুষ তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে—আকাঙ্ক্ষা আর উদ্বেগ নিয়ে। কী ঘটতে যাচ্ছে! এক চরম অনিশ্চয়তায় মানুষ এখানে-ওখানে বোঝার চেষ্টা করছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর টেলিভিশনে অস্থির সময় পার করছে। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি পেশ করেছে। সারা দেশ থেকে মানুষ ঢাকায় ছুটছে। ঘেরাও করবে গণভবন। মূলোৎপাটন করবে শাসনক্ষমতা আঁকড়ে থাকা ফ্যাসিবাদী এক শাসককে। নিপীড়ক সরকারও প্রস্তুত। তার আছে দলীয় বাহিনী। আছে সরকারি নানা বাহিনীকে অন্যায্যভাবে ব্যবহারের নিত্যদিনের অভ্যাস। কাজেই বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সবাই একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি অন্যদিকে আন্দোলন সফল হবে, মানুষ জীবনের মায়া ছেড়ে নেমে আসবে রাস্তায়—এমন এক আশাবাদেও তারা দুলছে।

অবশেষে মুহূর্তগুলো এসে হাজির হলো। কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকার উত্তরার পথে মানুষের দেখা মিলল। যাত্রাবাড়ির দিকে মানুষ জড়ো হতে থাকল ধীরে ধীরে। সাভারে নামল মানুষের ঢল। সময় গড়ালে দেখা গেল, যতদূর চোখ যায়, কেবল মানুষ আর মানুষ। এগিয়ে আসছে শহরের কেন্দ্রের দিকে। কিছু প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিল সরকারি দলের দুর্বৃত্তবাহিনী। তাদের পাশে ছিল রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর বিপথগামী ক্ষুদ্র একটা অংশ। কিন্তু সবাই হাল ছেড়ে দেয় শীঘ্রই। দৃঢ়চেতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ আর মরতে-প্রস্তুত মানুষের সামনে কোনো প্রতিরোধই টেকে না। জনতা গণভবনে পৌঁছে যায় দুপুর নাগাদ। পতন অত্যাসন্ন টের পেয়ে স্বৈরাচারী সরকার-প্রধান পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে। অভাবনীয় এক গণঅভ্যুত্থান দেখে সারা দুনিয়ার মানুষ।

কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব হলো? আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল একটা ছোট্ট দাবি নিয়ে। সরকারি বেশিরভাগ চাকরি বরাদ্দ ছিল নানা গোষ্ঠীর জন্য। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্য কোটার ব্যাপক অপব্যবহার চলছিল। ফলে দেশের বৃহৎ তরুণসমাজ সহজে সরকারি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছিল না। তাই কোটাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের দাবিতে তারা আন্দোলন করছিল দীর্ঘদিন ধরে। ২০১৮ সালে এ আন্দোলনে বড়ো সাফল্য অর্জিত হয়। সরকার কোটাব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। অথচ আন্দোলনকারীরা এটাকে যৌক্তিকভাবে কমাতে বলেছিল। কারণ দেশে পশ্চাৎপদ বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে, প্রতিবন্ধী মানুষ আছে—যাদের জন্য কিছু বাড়তি সুবিধা রাখতে হয়। কিন্তু গণবিরোধী সরকার আন্দোলনকারীদের কোনো যৌক্তিক দাবি না শুনে সম্পূর্ণ কোটাব্যবস্থাই বাতিল করে দিয়েছিল।

এরপর ২০২৪ সালের শুরুতে প্রহসনের নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করে সরকার আবার তার স্বমূর্তিতে ফিরে আসে। কৌশলে পুরোনো কোটা আবার চালু করে। তখন শিক্ষার্থীরা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। এবার তারা আন্দোলন শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নাম দিয়ে। এ নামের মধ্যেই আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্যের দিশা ছিল। কেবল চাকরি নয়, দেশে বিদ্যমান হাজারো বৈষম্য নিরসনের একটা আকাঙ্ক্ষা এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। প্রথম দিকে আন্দোলন সীমিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। ক্রমশ আন্দোলনে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও যোগ দিতে থাকে। জনবিচ্ছিন্ন সরকার আন্দোলনকারীদের মনোভাব বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ও নি। তারা নিজেদের ছাত্রসংগঠনকে দিয়ে বর্বর কৌশলে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়। আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে।

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই এ আন্দোলন শিক্ষার্থীদের সীমানা ছাড়িয়ে গণআন্দোলনে রূপ নিতে শুরু করে। তবে শিক্ষার্থীরাই শেষ পর্যন্ত এর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ছাত্রীদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ১৪ই জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে প্রায় সব ছাত্রী মিছিল করতে করতে বেরিয়ে এলে আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই রাতে এবং পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি দলের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা নিপীড়ন করেছে, বিশেষত নারী-শিক্ষার্থীদের—এই বর্বরতা ছিল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক-নির্ণায়ক ঘটনা। এ প্রেক্ষাপটেই ১৬ই জুলাই আন্দোলন তার সবচেয়ে কার্যকর ও পরিচিত ছবিটি পেয়ে যায়। এটা হলো রংপুরে আবু সাঈদের বুক চিতিয়ে পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে যাওয়া।

এরপর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বন্ধ করে দেওয়ার পরে আন্দোলন-কর্মসূচি গতি হারাতে পারত, কিন্তু বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তখন ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসে। অসাধারণ জমায়েত, আগ্রাসী মনোভাব এবং অবিশ্বাস্য প্রাণদানের মধ্য দিয়ে তারা আন্দোলনকে অধিকতর বেগবান করে তোলে। সারা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

বস্তুত শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে সমাজের অপরাপর মানুষের কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ দীর্ঘ দুঃশাসনের ফলে সমাজে সে অবস্থা আগে থেকেই বিরাজ করছিল। সরকার নির্বাচন নিয়ে একের পর এক তামাশা করেছে। নাগরিকের জীবনযাপন ও বিশ্বাস নিয়ে প্রতিনিয়ত অপমানজনক কথা বলেছে। সামান্য দাবি আর মতপ্রকাশের কারণে তাদেরকে নির্বিচারে নির্যাতন আর গুম-খুন করেছে। চরম অপমান আর হতমানে বিপর্যস্ত মানুষ নজিরবিহীন লুটপাট আর অর্থপাচারের সংবাদের মধ্যে দেখছিল হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। বাজারের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সরকারের ঘনিষ্ঠ লোকজনই সকল ধরনের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে।

বছরের পর বছর মানুষ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট হতে দেখেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকারের আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে কাজ করতে দেখেছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দুঃশাসনের অন্ধকারের নিচে বাংলাদেশের মানুষ নাগরিক হিসেবে ভয়াবহ অসম্মান এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

এই দানবীয় শাসন চালানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছিল সরকারের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু লোকে দেখল, হাজার হাজার সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরে, কিংবা জাল সনদ সংগ্রহ করে চাকরির সুবিধা নিয়েছে অনেকে। দেশের গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ অনবরত প্রকাশ হলেও সরকার তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। সকল অনিয়ম আর অবৈধতাকেই সে ঢেকে দিতে চাইছে অবকাঠামোগত 'উন্নয়নের গল্প' দিয়ে। কিন্তু মানুষ জানতে পারছিল, এসব অবকাঠামোর নির্মাণ ব্যয় পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অসম্ভব রকম বেশি।

বছরের পর বছর ধরে একের পর এক দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ হতে থাকে। হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিও যেন এক প্রাত্যহিক চিত্র হয়ে গরিব আর অসহায় মানুষকে উপহাস করতে থাকে। পরীক্ষায় পাশ-ফেলের ব্যবধান গৌণ হয়ে যায়, প্রশ্ন-ফাঁস হয়ে ওঠে নিত্যচিত্র। এমনকি প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকুরির পরীক্ষা এবং নিয়োগেও বছরের পর বছর অনিয়ম হয়েছে বলে জানা যায়। বিভিন্ন দেশে টাকা পাচারের কাহিনি প্রকাশ হতে থাকে। পুরো দেশ এক ধারাবাহিক প্রতারণার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। অবৈধভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলে রাখা একটি পরিবার ও তার অনুগত ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি আর তামাশার মধ্যে পুরো জনগোষ্ঠী ভয়ানক অসম্মানবোধ আর অনিশ্চয়তার শিকার হতে থাকে। তাই আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হলে প্রথম সুযোগেই সারা দেশের মানুষ এর সাথে ব্যাপক সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করে। অবশেষে ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত ক্ষণে ফ্যাসিবাদী সরকার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

গণঅভ্যুত্থানের শুরু থেকেই মানুষ শুধুমাত্র স্বৈরাচারী সরকারের পতনকে চরম সাফল্য হিসেবে ভাবে নি। তারা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে—জালিমের নয়, মজলুমের বাংলাদেশ নির্মাণ করতে চেয়েছে; গণতান্ত্রিক আর জনবান্ধব রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছে, যা স্বাধীনতার পাঁচ দশক অতিবাহিত হলেও আমরা করতে পারি নি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান অভূতপূর্ব এক অভ্যুত্থান, যার নজির পৃথিবীতে নেই। এই অভ্যুত্থান আমাদের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটা কোনো দলের নেতৃত্বে হয় নি। কয়েকটি দলের জোটের মাধ্যমেও সংঘটিত হয় নি। মূলত শিক্ষার্থীদের ডাকে অংশ নিয়েছেন সবাই। সেখানে প্রধান-অপ্রধান প্রায় সকল বিরোধীদলীয় মানুষজন ছিলেন। ধনী-গরিব ও মধ্যবিত্তরা ছিলেন। শহর ও গ্রামের মানুষ ছিলেন। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন মাদ্রাসার হাজারো শিক্ষার্থী। সবাই নিজেদের অবস্থান ভুলে রাস্তায় একত্রে লড়াই করেছিল একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এভাবে আন্দোলনের সময় এমন এক ভাষা তৈরি হয়েছিল, যার মাধ্যমে সবাই সবাইকে বুঝতে পারছিল। সে ভাষার মূল কথা, পারস্পরিক ভিন্নমত নিয়েও দেশের জন্য এবং দেশের মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করা যায়। অর্ধশত বছর উত্তীর্ণ বাংলাদেশে এ এক নতুন ভাষা। সেই ভাষা অনুযায়ী আজ আমাদের সকলকে নিয়ে সবার জন্য জনকল্যাণমূলক এক দেশ গড়তে কাজ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে অভ্যুত্থানে বিজয় একটা সুযোগ— সমস্ত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ, নতুনভাবে দেশ গড়ার সুযোগ। অতীতে এমন সুযোগ এদেশে আরও কয়েকবার এসেছে, কিন্তু আমরা তাকে ব্যবহার করতে পারি নি, ধরে রাখতে পারি নি। এবারের সুযোগকে তাই আমাদের রক্ষা করতে হবে। দেশে নানা মত ও বৈশিষ্ট্যের মানুষ আছে, নানা জাতি ও ধর্মের মানুষ আছে। সবাই যদি যার যার অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করে এবং সতর্কতার সাথে দেশ ও দশের দিকে নজর রাখে, তাহলেই কেবল এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, হাজারো শহিদের আত্মদানে একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে। সেই প্রত্যয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ভিন্নমতের প্রতি, ভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি, ভিন্ন রীতি ও সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোই গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা গ্রহণ করলেই আমাদের নতুন বিজয় সত্যিকারের গৌরবগাথা হয়ে উঠবে।

[সংকলিত]

শব্দার্থ ও টীকা

চিরাচরিত — অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে এমন।
উৎকণ্ঠা — উদ্বেগ; আশঙ্কা; ব্যাকুলতা।
গণভবন — বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন।
মূলোৎপাটন — মূলোচ্ছেদ; সমূলে বিনাশ; শিকড় সমেত তুলে ফেলা।
গ্রাফিতি — দেয়ালে আঁকা ছবি বা কথা যা সময়ের চিত্র তুলে ধরে।
ফ্যাসিবাদ —ইতালির স্বৈরশাসক মুসোলিনি প্রবর্তিত স্বৈর-শাসনপদ্ধতি; সর্বপ্রকার বিরোধিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এমন শাসনপদ্ধতি।
কারফিউ — সান্ধ্যআইন; সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পরে লোক চলাচলের নিয়ম-কানুন। [ইংরেজি carfew]
গণঅভ্যুত্থান — গণজাগরণ।
গণ আন্দোলন — যে আন্দোলনে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে; গণবিক্ষোভ।
প্রহসন — হাস্যরসপ্রধান নাটক ; ব্যঙ্গ; বিদ্রুপ।
অভূতপূর্ব — যা পূর্বে হয়নি বা ঘটেনি এমন।
সর্বজনীন — সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত; বারোয়ারী; সকলের জন্য মঙ্গলকর বা কল্যাণকর।
সহিষ্ণু — সহনশীল; বরদাস্তকারী; ধৈর্যধারণকারী; ধৈর্যশীল।

পাঠ পরিচিতি:

বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জুলাই গণঅভ্যুত্থান এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৯ বা ১৯৯০ থেকে পৃথক। এটা কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে হয়নি। তবু ফ্যাসিবাদী সরকারের বিপক্ষের সকল রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর দাবিনামার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কোনো দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ছাত্রসমাজ তাদের শিক্ষাজীবন শেষে ন্যায্যতার ভিত্তিতে কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা নিরসনের জন্য কোটাব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছিল। অনেক অত্যাচার-নির্যাতনের পর এই দাবি মেনে নেওয়া হলেও কৌশলে তা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আবারও আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকার চরম দমননীতি এবং হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এতে গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং সরকার-প্রধান দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য আবারও একটা সুন্দর দেশ নির্মাণের সুযোগ এনে দিয়েছে। একে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের তুলনা করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
(শ্রেণি-শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে)

২। মাগো, ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি।
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

এই রকম উদ্দীপনামূলক ৫টি গানের প্রথম ৪টি করে লাইন লিখে শ্রেণি-শিক্ষকের নিকট জমা দাও।
(শ্রেণি-শিক্ষক বাড়ির কাজ হিসেবে এটি মূল্যায়ন করবেন)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গণভবন কী?

ক. জনগণের আরাম-আয়েশ করার ভবন
খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন
গ. যে ভবনে সরকারি কাজ-কর্ম হয়
ঘ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সরকারি বাসভবন

২। 'জনবিচ্ছিন্ন সরকার' বলতে কি বোঝ?

ক. জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সরকার
খ. জনগণের জন্য বিধিবদ্ধ সরকার
গ. জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন যে সরকার
ঘ. মানুষের সাথে সম্পর্কহীন সরকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

> বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
> আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।
> তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
> তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা
> ও জনতা, এই জনতা।

৩. কবিতাংশটি 'আমাদের নতুন গৌরবগাথা' এর যে ভাবের প্রতিফলন ঘটায়, তা হলো-

i. অধিকার আদায়ে নবজাগরণ
ii. শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন
iii. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৪. 'আমাদের নতুন গৌরবগাথা' এর শিক্ষার্থী-জনতা আর কবিতাংশের জনতার জাগরণের কারণ নিচের কোন বাক্যে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. আন্দোলন অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
খ. শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে সমাজের অপরাপর মানুষের কোনো অসুবিধাই হয়নি।
গ. দীর্ঘ দুঃশাসনের ফলে সমাজে সে অবস্থা আগেই বিরাজ করছিল।
ঘ. দুর্নীতি আর তামাশার মধ্যে পুরো জনগোষ্ঠী ভয়ানক অসম্মান বোধ আর অনিশ্চয়তার শিকার হওয়ার হয়েছিল।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সময়টা ২০২২ সালের এপ্রিল মাস। ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশচুম্বী দাম, জ্বালানি-ওষুধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহে তীব্র ঘাটতি এবং সরকারী দলের দমন-পীড়ন নীতির কারণে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী নেমে আসে রাজপথে। তাদের সাথে যোগ দেয় রাষ্ট্রীয় সেবা, স্বাস্থ্য, বন্দর, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ডাক থেকে শুরু করে প্রায় এক হাজার ট্রেড ইউনিয়ন। তারা দেশের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির জন্য প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের পরিবারকে দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবি করে। কিন্তু সরকার সেনা মোতায়েন করে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে এবং সরকারপন্থিরা বিক্ষোভকারীদের ওপর ভয়াবহ হামলা চালায়। এতে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী আহত হন। ফলে আন্দোলন দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে জনগণের আন্দোলনের চাপে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে ১৩ই জুলাই ভোরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে প্রথমে মালদ্বীপ, তারপর সিঙ্গাপুরে যান।

ক. কোটা সংস্কার আন্দোলনে বড়ো সাফল্য কত সালে অর্জিত হয়?
খ. 'অর্ধশত বছর উত্তীর্ণ বাংলাদেশে এ এক নতুন ভাষা'। – বাক্যটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'আমাদের নতুন গৌরবগাথা' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'আমাদের নতুন গৌরবগাথা' প্রবন্ধের সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে না'।
–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

বন্দনা

শাহ মুহম্মদ সগীর

কবি-পরিচিতি [শাহ মুহম্মদ সগীর আনুমানিক ১৪-১৫ শতকের কবি। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইউসুফ *জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কাব্যের রাজবন্দনায় 'মহামতি গ্যেছ' বলে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বলে অনুমিত। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করে মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে বিবেচনা করেছেন। শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর ইউসুফ *জোলেখা* কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, তবে কাব্যে ধর্মীয় পটভূমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান।

দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ।
যান দয়া হস্তে জন্ম হৈল বসুধায় ॥
পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত।
কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত ॥
অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল।
তান দয়া হস্তে হৈল এ ধড় বিশাল ॥
না খাই খাওয়াএ পিতা না পরি পরাএ।
কত দুক্ষে একে একে বছর গোঞাএ ॥
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন।
কনে বা সুধিব তান ধারক কাহন ॥
ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হস্তে বাড়।
দোসর-জনম দিলা তিঁহ সে আহ্মার ॥
আহ্মা পুরবাসী আছ জথ পৌরজন।
ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ।
তান সভান পদে মোহার বহুল ভকতি।
সপুটে প্রণাম মোহার মনোরথ গতি ॥
মুহম্মদ সগীর হীন বহোঁ পাপ ভার।
সভানক পদে দোয়া মাগোঁ বার বার।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরবাসী- নগরবাসী। **বন্দনা**- স্তুতি, প্রশংসা। **করোঁ** - করি। **যান**- যার। **হন্তে**- হতে, থেকে। **থুইলা**- রাখল। **অশক্য**- অশক্ত, দুর্বল। **আছিলুঁ**- ছিলাম। **মুই**- আমি। **ছাবাল**- ছাওয়াল, ছেলে, সন্তান। **তান**- তাঁর। **গোঙাও**- গুজরান করে, অতিবাহিত করে। **পিতাক**- পিতাকে। **নেহায়**- স্নেহে। **বিদিত**- জানা। **মনোরথ**- ইচ্ছা, অভিলাষ। **জিউ**- আয়ু, জীবিত থাকা। **কনে**- কখনও। **ধারক**- ধারের, ঋণের। **কাহন**- ষোলোপণ, টাকা।

বাড়- বাড়া, বেশি। **দোসর**- দ্বিতীয়। **মোহার**- আমার। **সপুটে**- করজোড়ে। **সভান**- সবার। **সভানক**- সবার। **বসুধায়**- পৃথিবীতে। **তিঁহ**- তিনিও। **আন্ধার**- আমার। **বিদিত**- জানা। **মনোরথ**- ইচ্ছা, অভিলাষ। **পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত**- মায়ের স্নেহ মমতার তুলনা নেই। মায়ের সদাজাগ্রত কল্যাণদৃষ্টি সন্তানের জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ। শিশুকে মা বহু যত্নে লালন-পালন করেন। পিঁপড়ার ভয়ে মা সন্তানকে মাটিতে রাখে নি–এই কথা উল্লেখ করে কবি মায়ের সেই স্নেহ মমতা ও কল্যাণ দৃষ্টিকেই বড় করে তুলেছেন। **অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল**– এখানে কবি মানব শিশুর শৈশবকালীন অসহায় অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মায়ের আদর-যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করে শিশু ধীরে ধীরে পরিণত মানুষ হয়ে উঠে। কবি তাঁর স্নেহময়ী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

পাঠ-পরিচিতি :

শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ *জোলেখা* কাব্যের বন্দনা পর্ব থেকে গৃহীত এই কবিতাংশ 'বন্দনা' নামে সংকলিত হয়েছে। 'বন্দনা' পর্ব যথেষ্ট বড়, এখানে শুধু গুরুজনদের প্রতি বন্দনার অংশটুকু স্থান পেয়েছে। কবি তাঁর মূল কাব্যের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। সংকলিত এই কবিতাংশে জন্মদাতা পিতামাতার ও জ্ঞানদাতা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পিতামাতা অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করে পরম যত্নে সন্তানকে বড় করে তোলেন। শিক্ষক জ্ঞানদান করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই তাঁদের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। কবি তাঁর কাব্য রচনায় সাফল্য লাভের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন। শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের প্রধান ধর্ম। কবিতাংশে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কীসের ভয়ে মা সন্তানকে মাটিতে রাখেননি?

ক. ঠাণ্ডা
খ. পিঁপড়া
গ. পোকা
ঘ. মশক

২. 'না খাই খাওয়াএ পিতা'— এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে –

i. অপত্যস্নেহ
ii. সন্তান বাৎসল্য
iii. উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার লাভ করে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ছুটে যান শৈশবের বিদ্যাপীঠে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন তাঁর দীক্ষাগুরুদের, যাঁদের কাছে তিনি হাতেখড়ি নিয়েছিলেন।

৩। উদ্দীপকের অমর্ত্য সেন-এর মাঝে 'বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. স্মৃতিকাতরতা
খ. স্বদেশপ্রেম
গ. গুরুভক্তি
ঘ. স্বাজাত্যবোধ

৪। তাঁর এহেন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিচের কোন চরণে?

ক. ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ
খ. দোসর জনম দিলা তিঁহ সে আম্কার
গ. যান দয়া হস্তে জন্ম হৈল বসুধায়
ঘ. কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বায়েজিদ বোস্তামির মা এক রাতে পানি খেতে চান। ঘরে পানি না থাকায় তা বাহির থেকে সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। পানির পাত্র হাতে বায়েজিদ সারারাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে ঘুম থেকে জাগলেই মাকে পানি দিতে পারেন। মা যেন পিপাসায় কষ্ট না পান।

ক. 'বন্দনা' কবিতায় পিতার চেয়েও কাকে বেশি শ্রদ্ধা দেখাতে বলা হয়েছে?
খ. 'দোসর জন্ম' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের বায়েজিদের মাঝে 'বন্দনা' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "প্রকাশিত দিকটিই 'বন্দনা' কবিতার একমাত্র দিক নয়" – মন্তব্যটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

হাম্‌দ্‌

আলাওল

[**কবি-পরিচিতি :** সৈয়দ আলাওল আনুমানিক ১৬০৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জোবরা গ্রামে, মতান্তরে ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের অমাত্য। জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। যুদ্ধে পিতা নিহত হলে আলাওল পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে আরাকানে নীত হন। সেখানে তিনি আরাকানরাজ সাদ উমাদারের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সেনাদলে চাকরি লাভ করেন। রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুর তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া তিনি রাগসংগীত, যোগ ও ভেষজশাস্ত্র, সুফিতত্ত্ব ও বৈষ্ণবসাধনা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। আলাওলের যেসব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো : *পদ্মাবতী*, *সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল*, *হপ্তপয়কর*, *সেকান্দরনামা*, *তোহফা* ইত্যাদি। আলাওলের কাব্য অনুবাদমূলক হলেও তা মৌলিকতার দাবিদার। আলাওল আনুমানিক ১৬৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তম ॥
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস ॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করি নানা ভাঁতি ॥
সৃজিল পাতাল মহী স্বর্গ নরক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার ॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড ॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবারাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥
সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
সৃজিল সমুদ্র মেরু জলচরকুল।
সৃজিল সিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥

সৃজিলেক বন তরু ফল নানা স্বাদ।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔষদ ॥
সৃজিয়া মানব-রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভুগত ॥
সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তারে সাজ ॥
সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাকে কৈল দাস ॥
কাকে কৈল সুখ ভোগে সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখী উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্ধ ॥
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ ॥
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনী
কাকে কৈল নির্গুণী, কাকে কৈল গুণী ॥

শব্দার্থ ও টীকা

হামদ- সাধারণ অর্থ: প্রশংসা, বিশেষ অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা। **বিছমিল্লা**- আল্লাহর নামে শুরু করা, কোনো কাজ শুরু করার আগে মুসলমানেরা 'বিসমিল্লাহ' বলেন। পূর্ণ বাক্যটি হলো : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। অর্থ : আমি পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। **করতার**- কর্তা, প্রভু। **প্রকটিল**- প্রকাশ করল। **কবিলাস**- কৈলাস বা স্বর্গ। **ক্ষিতি**- মাটি। **সপ্ত মহী**- সাত স্তর বিশিষ্ট পৃথিবী। **নর্ক**- নরক। **সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড**- সাত স্তর বিশিষ্ট আকাশ। **চতুর্দশ ভুবন**- পৃথিবীর সাত স্তর এবং আকাশের সাত স্তর মিলে চর্তুদশ ভুবন। **দিবাকর**- সূর্য। **শশী**-চাঁদ। **পাঁতিপাঁতি**- পঙক্তিতে পঙক্তিতে। **সিপিতে**- ঝিনুকে। **ভুঞ্জয়**- ভাগ করে। **ভাঁতি**- শোভা, **ভুগত**- ভোগ করতে, **দর্শাইতে**- দেখাতে।

পাঠ-পরিচিতি

'হামদ' কবিতাংশটি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি *পদ্মাবতী* কাব্যের প্রারম্ভে মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক পর্বের অংশ।

কবি এই কবিতাংশে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কবি মহান স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা করেছেন। আগুন, বাতাস, পানি ও মাটি এসব উপাদান সহযোগে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর জলচরপ্রাণী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা,পশুপাখি এবং সব শেষে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের উপভোগের জন্য বিচিত্র উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। বিধাতা মানুষকে ভাগ্যের অধীন করে পার্থিব জীবনে সুখী কিংবা দুঃখী, গুণী কিংবা নির্গুণ করে পাঠিয়েছেন। কবিতাংশে স্রষ্টার খেয়াল ও বিধি অনুযায়ীই যে সৃষ্টিজগত ও মানবভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে তারই আলোকপাত বিধৃত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'হামদ' কবিতাংশের আলোকে প্রভু জীবের জন্য প্রথমে কী সৃষ্টি করেছেন?

ক. জ্যোতি খ. ক্ষিতি

গ. শশী ঘ. মহী

২। 'হামদ' কবিতাংশে কবি আলাওল– এর মতে, স্রষ্টার জীব সৃষ্টির কারণ কী?

ক. আনন্দ লাভ খ. সক্ষমতা প্রকাশ

গ. আনুগত্য লাভ ঘ. স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তারকা রবি শশী খেলনা তব হে উদাসী
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি।

৩। উদ্দীপকটি 'হামদ' কবিতাংশের কোন ভাবের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. স্রষ্টার লীলা খ. সৃষ্টিসম্ভার

গ. সৃষ্টিরহস্য ঘ. স্রষ্টার খেয়াল

৪। সঙ্গতিপূর্ণ দিকটি ফুটে উঠেছে যে চরণে–

i. সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ii. সৃজিল সিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল

iii. সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

এই সুন্দর ফুল, এই সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা, তোমার মেহেরবানি
এই শস্য শ্যামল ফসল ভরা
মাঠের ডালি খানি
খোদা, তোমার মেহেরবানি।

ক. 'হামদ' কবিতাংশে প্রথমে কাকে প্রণাম করার কথা বলা হয়েছে?

খ. 'কাকে কৈল ঈশ্বর, কাকে কৈল দাস '- এ চরণে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটিতে 'হামদ' কবিতাংশের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ."উদ্দীপকে মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও 'হামদ' কবিতাংশে কবি আলাওল স্রষ্টার সৃষ্টির বৈচিত্র্য আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছেন।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

বঙ্গবাণী

আবদুল হাকিম

[কবি-পরিচিতি : আনুমানিক ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে সন্দ্বীপের সুধারামপুর গ্রামে আবদুল হাকিম জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি আবদুল হাকিমের স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি ছিল অটুট ও অপরিসীম প্রেম। সেই যুগে মাতৃভাষার প্রতি এমন গভীর ভালোবাসার নিদর্শন ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কালজয়ী আদর্শ। নূরনামা তাঁর বিখ্যাত কাব্য। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো : ইউসুফ *জোলেখা*, *লালমতি*, *সয়ফুলমুলক*, *কারবালা*। তিনি ১৬৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ ॥
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন ॥
আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ ॥
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত ॥
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন ॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী ॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সে সবের গণ ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

শব্দার্থ ও টীকা

হাবিলাষ- অভিলাষ, প্রবল ইচ্ছা। **ছিফত**- গুণ। **নিরঞ্জন**- নির্মল (এখানে সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ)। **বঙ্গবাণী**- বাংলা ভাষা। **মারফত**- মরমি সাধনা, আল্লাহকে সম্যকভাবে জানার জন্য সাধনা। **জুয়ায়**- জোগায়। **ভাগ**- ভাগ্য। **দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়**- এই কবিতাটি সপ্তদশ শতকে রচিত। তৎকালেও এক শ্রেণির লোক নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি, এমন কি নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কেও ছিল বিভ্রান্ত এবং সংকীর্ণচেতা। শিকড়হীন পরগাছা স্বভাবের এসব লোকের প্রতি কবি তীব্র ক্ষোভে বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়'। **আপে**- স্বয়ং, আপনি।

পাঠ-পরিচিতি

'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কবি আবদুল হাকিমের *নূরনামা* কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিবেশে বঙ্গভাষী এবং বঙ্গভাষার প্রতি এমন বলিষ্ঠ বাণীবদ্ধ কবিতার নিদর্শন দুর্লভ।

কবি এই কবিতায় তাঁর গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। আরবি ফারসি ভাষার প্রতি কবির মোটেই বিদ্বেষ নেই। এ সব ভাষায় আল্লাহ ও মহানবি(সা.)র স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। তাই এসব ভাষার প্রতি সবাই পরম শ্রদ্ধাশীল। যে ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য নয়, যে ভাষায় অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময় করা যায় না সে সব ভাষাভাষী লোকের পক্ষে মাতৃভাষায় কথা বলা বা লেখাই একমাত্র পন্থা। এই কারণেই কবি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। কবির মতে, মানুষ মাত্রেই নিজ ভাষায় স্রষ্টাকে ডাকে আর স্রষ্টাও মানুষের বক্তব্য বুঝতে পারেন। কবির চিত্তে তীব্র ক্ষোভ এজন্য যে, যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মমতা নেই, তাদের বংশ ও জন্মপরিচয় সম্পর্কে কবির মনে সন্দেহ জাগে। কবি সখেদে বলেছেন, এ সব লোক, যাদের মনে স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ নেই তারা কেন এদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় না! বংশানুক্রমে বাংলাদেশেই আমাদের বসতি, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা বাংলায় বর্ণিত বক্তব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এই ভাষার চেয়ে হিতকর আর কী হতে পারে। কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'বঙ্গবাণী' কবিতার শেষ পঙক্তি কোনটি?

ক. দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি
খ. নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়
গ. বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী
ঘ. সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি

২। 'সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'– কবি আবদুল হাকিম কাদের সম্পর্কে এ উক্তি করেছেন?

ক. নিজ দেশ ত্যাগ করে যারা বিদেশে যায়
খ. বাংলাদেশে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে
গ. দেশি ভাষায় বিদ্যা লাভ করে যে তৃপ্ত নয়
ঘ. যারা বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে মনে করে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়ায় বাবা খুশি হয়ে রেডিওতে গান শোনার জন্য সিফাতকে একটি মোবাইল সেট কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুদিন বাদেই সে মন খারাপ করে সেটটা বাবাকে ফেরত দিল। কারণ FM চ্যানেলগুলোতে নাকি উপস্থাপকরা বাংলা ভাষাকে ইচ্ছেমতো বিকৃত করে উচ্চারণ করে আর ইংরেজি ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখায়। সিফাতের এটা ভালো লাগে না।

৩। সিফাতের মন খারাপ করার মধ্য দিয়ে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় আবদুল হাকিমের যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. মাতৃভাষাপ্রীতি
ii. বাংলা ভাষাপ্রীতি
iii. ইংরেজি বিদ্বেষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪। উক্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে কোন পঙক্তিতে?

ক. দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ
খ. সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন
গ. দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি
ঘ. বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী

সৃজনশীল প্রশ্ন

মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা।
আ মরি বাংলা ভাষা।
কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া আসা
আ মরি বাংলা ভাষা।

ক. 'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'নিরঞ্জন' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
খ. 'দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে 'বঙ্গবাণী' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ.'উক্ত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কবির চেয়ে আবদুল হাকিমের অবস্থান সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ'–'বঙ্গবাণী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি-পরিচিতি :** মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনের শেষে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ জন্মে। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'। পাশ্চাত্য জীবনযাপনের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তীব্র আবেগ তাঁকে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যরচনায় উদ্‌বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র কষ্টকর অভিজ্ঞতায় তাঁর এই ভুল ভেঙেছিল। বাংলা ভাষায় কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটে। তাঁর অমর কীর্তি *'মেঘনাদ-বধ কাব্য'*। তাঁর অন্যান্য কাব্য : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*। তাঁর নাটক : *কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী;* এবং প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা* ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট প্রবর্তন করে তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন কবি পরলোকগমন করেন।]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা? — যত দিন যাবে,

প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে

বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে

বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে

নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে

লইছে যে নাম তব বঙ্গের সংগীতে।

শব্দার্থ ও টীকা : সতত–সর্বদা। **বিরলে**–একান্ত নিরিবিলিতে। **নিশা**– রাত্রি। **ভ্রান্তি**-ভুল। **বারি-রূপ কর**–প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয়, তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচ্ছে। **চতুর্দশপদী কবিতা**– ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। চৌদ্দ-চরণ-সমন্বিত, ভাবসংহত ও সুনির্দিষ্ট। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষটক (Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষটক ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। 'কপোতাক্ষ নদ' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে মিলবিন্যাস : কখকখ কখখক গঘগ ঘগঘ।

পাঠ-পরিচিতি : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কবির *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* থেকে গৃহীত হয়েছে। এই কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মধুসূদন এই নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কত দেশে কত নদ-নদী তিনি দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মায়ের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন ! কপোতাক্ষ নদের কাছে তাঁর সবিনয় মিনতি–বন্ধুভাবে তাকে তিনি স্নেহাদরে যেমন স্মরণ করেন, কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে সস্নেহে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ যেন তার স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীদের নিকট ব্যক্ত করে। দেশমাতৃকার প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কবিতায় তাই ধরা পড়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার নিকটবর্তী নদী বা খাল সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি রচনাকালে কবি কোন দেশে ছিলেন?

ক. ফ্রান্সে খ. ইংল্যান্ডে
গ. ইতালিতে ঘ. আমেরিকায়

২। 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?' – এ উক্তিতে কবির কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

i. মমতা
ii. অনুরাগ
iii. ভ্রান্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবাস জীবনে ফাস্টফুডের দোকানে
কত খাবার খেয়েছি আমি জীবনে।
মায়ের হাতের পিঠার কথা
ভুলি আমি কেমনে?

৩। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সুখস্মৃতির অনুপম চিত্রায়ণ　　খ. রঙিন কল্পনার নিদর্শন
গ. কষ্টকর স্মৃতির কাতরতা　　ঘ. স্নেহাদরের কাতরতা

৪। অনুচ্ছেদটির মূল বক্তব্য নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।
খ. জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
গ. এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
ঘ. আর কি হে হবে দেখা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

ছোটোকালে ছিলাম বাঙালিদের বালুচরে,
সাঁতরায়ে নদী পাড়ি দিতাম বারবার এপার হতে ওপারে,
ডিভি লটারি সুযোগ করে দিলে ছুটে চলে যাই আমেরিকায়
কিন্তু আজ মন শুধু ছটফটায় আর শয়নে স্বপনে বাড়ি দিয়ে যায়,
মধুময় স্মৃতিগুলো আমাকে কাঁদায়, তবু দেশে আর নাহি ফেরা হয়।

ক. সনেটের ষটকে কী থাকে?
খ. 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার আলোকে তুলে ধর।
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা-ই 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাব" – কথাটির সত্যতা বিচার কর।

জীবন-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[**কবি-পরিচিতি :** হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ১৭ই এপ্রিল হুগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আশ্রয়ে তিনি ইংরেজি শেখেন। পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি চাকরি, স্কুল-শিক্ষকতা এবং পরিশেষে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় তিনি *বৃত্রসংহার* নামক মহাকাব্য রচনা করেন। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য: *চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু, আশাকানন, ছায়াময়ী* ইত্যাদি। ২৪শে মে ১৯০৩ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।]

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন;
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হইও না কাতর।

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়
সমর-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

শব্দার্থ ও টীকা : কাতর স্বরে– দুর্বল কণ্ঠে, করুণভাবে। **দারা** – স্ত্রী। **বাহ্যদৃশ্যে** – বাইরের জগতের চাকচিক্যময় রূপে বা জিনিসে। **জীবাত্মা** – মানুষের আত্মা। আত্মা যদিও অমর, কিন্তু মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কাজেই দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন চলে যাবে, চিরকাল দেহকে আঁকড়ে থাকতে পারবে না। **অনিত্য** – অস্থায়ী, যা চিরকালের নয়। **আকিঞ্চন** – চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা; **আশ** –আশা। **ভবের** – জগতের, সংসারের। **সমরাঙ্গনে** – যুদ্ধক্ষেত্রে (কবি মানুষের জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন)। **বীর্যবান** – শক্তিমান। **মহিমা** – গৌরব। **প্রাতঃস্মরণীয়** – সকাল বেলায় স্মরণ করার যোগ্য, অর্থাৎ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। **ধ্বজা** – পতাকা, নিশান। **বরণীয়** – সম্মানের যোগ্য। **সংসারে-সমরাঙ্গনে** – যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের মতো সংসারেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হবে। **স্বপন** – রাতের স্বপ্নের মতোই মিথ্যা বা অসার। **আয়ু যেন শৈবালের নীর** – শেওলার ওপর পানির ফোঁটার মতো ক্ষণস্থায়ী। **স্বীয়** – নিজ, আপন। **পদাঙ্ক** – কোনো মহৎ ব্যক্তির কৃতকর্ম বা চরিত্র। **যশোদ্বারে** – খ্যাতির দ্বারে।

পাঠ-পরিচিতি : জীবন কেবল নিছক স্বপ্ন নয়। কাজেই এ পৃথিবীকে শুধু স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ বলা যায় না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং পরিজনবর্গ কেউ কারও নয়, একথাও ঠিক নয়। মানব-জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। মিথ্যা সুখের কল্পনা করে দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই; তা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও নয়। সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কেননা বৈরাগ্যে মুক্তি নেই। আমাদের জীবন যেন শৈবালের শিশিরবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং মানুষকে এ পৃথিবীতে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরও বরণীয় হতে হবে। কেননা জীবন তো একবারই। নেতিবাচকতা পরিহারপূর্বক মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনপাঠের দীক্ষা গ্রহণের কথা কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতাটি মার্কিন কবি Henry Wadsworth Longfellow-র (১৮০৭-১৮৮২) 'A Psalm of life' শীর্ষক ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তুমি আদর্শ মনে কর এমন একজন মানুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ুকে কোনটির সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. নদীর জল খ. পুকুরের জল
গ. শৈবালের নীর ঘ. ফটিক জল

২। কবি 'সংসার সমরাঙ্গন' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ক. যুদ্ধক্ষেত্রকে খ. জীবনযুদ্ধকে
গ. প্রতিরোধ যুদ্ধকে ঘ. অস্তিত্বকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

শুকুর মিয়া একজন খুদে ব্যবসায়ী। সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম প্রথম লাভ পান। এক সময় তার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। এতে তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন বন্ধু হাতেম তাকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলার পরামর্শ দেন। শুকুর মিয়া তার পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করেন।

৩। উদ্দীপকের শুকুর মিয়ার লক্ষ্য কী?

ক. যশোদ্ধার
খ. অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা
গ. সংসার সমরাঙ্গনে টিকে থাকা
ঘ. বরণীয় হওয়া

৪। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে শুকুরের যে গুণের আবশ্যক তা হলো –

ক. সাহস খ. সংগ্রাম
গ. আত্মবিশ্বাস ঘ. সঙ্কল্প

সৃজনশীল প্রশ্ন

রবার্ট ব্রুস পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক সময় হতাশ হয়ে বনে চলে যান। সেখানে দেখেন একটা মাকড়সা জাল বুনতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। অবশেষে সেটি সপ্তমবারে সফল হয়। এ ঘটনা রবার্ট ব্রুসের মনে উৎসাহ জাগায়। তিনি বুঝতে পারেন জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন।

ক. কবি কোন দৃশ্য ভুলতে নিষেধ করেছেন?

খ. কীভাবে 'ভবের' উন্নতি করা যায়?

গ. পরাজয়ের গ্লানি রবার্ট ব্রুসের মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে সেটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'হতাশা নয় বরং সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যই মানুষের জীবনে চরম সাফল্য বয়ে আনে '– উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**লেখক-পরিচিতি :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর *বনফুল* কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি *Gitanjali: Song Offerings* সংকলনের জন্য এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বস্তুত তাঁর সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে *মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, বিসর্জন, ডাকঘর, রক্তকরবী, গল্পগুচ্ছ, বিচিত্র প্রবন্ধ* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয় !

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ॥

শব্দার্থ ও টীকা : সূর্য করে – সূর্যের কিরণে। **চিরতরঙ্গিত** – সর্বদা কল্লোলিত, বহমান। **লভি** – লাভ করি। **জীবন্ত হৃদয় মাঝে** – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য অংশে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **বিরহমিলন ... অশ্রুময়**– মানুষের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা নিয়ে তাঁর জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। আর তার সৃষ্টির মধ্যে ফলিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিপুল এক আখ্যান। **অমর আলয়** – অমর সৃষ্টি অর্থে। **নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই** – রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ বিপুল। মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগৎকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির মধ্য থেকে রূপ-রস-গন্ধ যেন মানুষ অনুভব করতে পারে, তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ফুটিয়ে তুলছেন সৃষ্টির কুসুম।

পাঠ-পরিচিতি : কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কড়ি ও কোমল* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই জগৎ সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। মানুষের হাসি-কান্না, মান-অভিমান, আবেগ-ভালোবাসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। জগতের মায়া ত্যাগ করে অন্য কিছুর আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়ে কবি তাই মৃত্যুবরণ করতে চান না। তিনি অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন, মানুষের মনজয়ী রচনা সৃজনের মাধ্যমে সবার কাছে আদৃত হওয়ার। পৃথিবীর নরনারীর সুখ-দুঃখ-বিরহ যদি ঠিকভাবে তাঁর সৃষ্টিতে ঠাঁই পায়, তবেই তিনি অমর হবেন। তা-না হলে তাঁর রচনা শুকনো ফুলের মতোই সবার কাছে অনাদৃত হয়ে পড়বে। সৎ ও শুভকর্ম করে জগতে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। কবিতাটিতে এ প্রত্যয়ই প্রতিফলিত হয়েছে। জীবন তো একবারই। জীবনে নেতিবাচকতা পরিহারপূর্বক মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনপাঠের দীক্ষা কবিতাটিতে উচ্চকিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। 'প্রতিটি জীব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়'– উদাহরণের সাহায্যে কথাটি বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি কোথায় অমর আলয় রচনা করতে চেয়েছেন?

ক. স্বর্গে খ. পৃথিবীতে
গ. পুষ্পিত কাননে ঘ. মানুষের মাঝে

২। কবি মানব-হৃদয়ে কীভাবে ঠাঁই পেতে চেয়েছেন?

ক. ভালোবেসে খ. সৃষ্টির মাধ্যমে
গ. ফুল ফুটিয়ে ঘ. সংগীতের সাহায্যে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় – হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;

৩। উদ্দীপকের বক্তব্যের সঙ্গে 'প্রাণ' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে যে বাক্যে, তা হলো –

i. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

ii. মানবের সুখে-দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়!

iii. হাসি মুখে নিয়ে ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়॥

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. iii
গ. ii ও iii   ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি– চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ।

ক. কবি কাদের মাঝে বাঁচতে চান?
খ. এ পৃথিবীতে কবি অমর আলয় রচনা করতে চান কেন?
গ. উদ্দীপকে প্রত্যাশিত বিষয়টি 'প্রাণ' কবিতার ভাবের সাথে কীভাবে মিশে আছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'প্রাণ' কবিতার আংশিকভাব মাত্র, পূর্ণরূপ নয়" – যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে লিখ।

জুতা-আবিষ্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র –
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ-ফেলা মাত্র!
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হলো খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে,
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য–
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধুলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন-বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
 যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী
 দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
 ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
 ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য?'
  কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
  পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
 কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
 ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
 ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য,
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
 ধুলার মাঝে নগর হলো উহ্য।
  কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
  জগৎ হলো ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
 মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
 নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
 ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
 সর্দিজ্বরে উজাড় হলো দেশটা।
  কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
  ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুনঃ যতেক গুণবন্ত –
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাস পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন থাকে না কোনো রন্ধ্র!
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি –
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস-রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা-হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিত-মতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি,
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে!
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ!'

মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতা পরা –
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

শব্দার্থ ও টীকা : চরণ – পা। **প্রতিকার** – প্রতিবিধান, সমাধান। **মাহিনা** – পারিশ্রমিক, বেতন। **পুষিনু** – পোষণ করি, লালন-পালন করি। **পিপে** – ঢাক বা ঢোলের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের তৈরি পাত্র। **ভিস্তি** – পানি বহনের জন্য চামড়ার তৈরি এক প্রকার থলি। **পাঁক** – কাদা, কর্দম। **কিস্তি** – নৌকা বা জাহাজ, জলযান। **গুণবন্ত** – গুণবান, গুণী। **মহী** – পৃথিবী, ধরণী। **ফরাশ** – মেঝে বা তক্তপোশে বিছানোর জন্য কার্পেট বা বিছানা, মাদুর। **রন্ধ্র** – ছিদ্র, ফুটো। **চামার** – চর্মকার, মুচি। **যোগ্যমতো** – উপযুক্ত। **কুলপতি** – বংশের প্রধান, কুলশ্রেষ্ঠ।

পাঠ-পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কল্পনা* কাব্য থেকে 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ধুলাবালি থেকে রাজার পা দুটিকে মুক্ত রাখার নানা প্রসঙ্গই কবিতাটির মূল উপজীব্য। রাজা তাঁর মন্ত্রীদের রাজ্য থেকে ধুলাবালি দূর করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রীরা রাজ্যের ধুলাবালি ঝাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এতে রাজ্য ধুলোয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। রাজার আদেশ মানতে গিয়ে রাজ্যের সভাসদ কোনো উপায় যেন খুঁজে আর পান না। অবশেষে রাজ্যেরই এক বয়স্ক চর্মকার নিজ বুদ্ধিতে রাজার পদযুগল চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়। এভাবে রাজার পা ধুলার স্পর্শ থেকে মুক্তি পায়। সাধারণ সমস্যার সমাধান সাধারণ বুদ্ধিতেই করতে হয়। জটিলভাবে করতে গেলে বিড়ম্বনাই বাড়ে। সমস্যা সমাধানে পদস্থ জনই যে অনিবার্য তাও নয়। সাধারণের দ্বারাও অসাধারণ কৃত্য সম্পাদিত হতে পারে। কবিতায় তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। ক্ষুদ্র প্রাণীও মানুষের মহৎ উপকার করতে পারে– এ বিষয়ে একটি কাহিনি লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ক. ১৮৬১ খ. ১৯১৩
গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯৪১

২। পণ্ডিতের মুখ চুন হয়েছিল কেন?

ক. মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়ায় খ. করণীয় খুঁজে না পাওয়ায়

গ. দায়িত্বে অবহেলা করায় ঘ. মন্ত্রীর আদেশ শুনে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

বন্ধু এন্টনিওর জন্য জামিন হয়ে বাসানিও সুদখোর শাইলকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার আনে। এ সময় শর্তে উল্লেখ থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা ফেরতদানে ব্যর্থ হলে শাইলক বাসানিওর বুকের এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার সুযোগে শাইলক আদালতে যায়। অসহায় বোধ করে বাসানিও। এমন সময় এক তরুণ উকিল বলেন, শাইলক ঠিক এক পাউন্ড মাংস কাটতে পারবেন–কমবেশি নয় এবং শর্তে উল্লেখ না থাকায় কোনো রক্ত ঝরাতে পারবে না।

৩. উদ্দীপকের তরুণ উকিলের সঙ্গে জুতা আবিষ্কার কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. হবু খ. গোবু

গ. পণ্ডিত ঘ. চামার

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিদ্যালয়ের চাল ফুটো হয়ে ঘরে বৃষ্টির পানি পড়ছে। জেলা বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিদর্শনে এলে প্রধান শিক্ষক বিষয়টি তাঁর নজরে আনেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে শোনেন এবং বলেন, অচিরেই তিনি এ ব্যাপারে উপরে লিখবেন। অনুমোদন পেলে বাজেট করে পাঠিয়ে দেবেন। তাই তাকে আগামী বাজেট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। জেলা বোর্ড কর্মকর্তার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি এলাকায় আলোচিত হলে বেকার-ভবঘুরে যুবক সোহেলকে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। সে তার বন্ধুদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করে দ্রুত স্কুলঘরের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করে।

ক. রাজা হবু ধুলি দূর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কাকে?

খ. জলের জীব জল বিনা মরল কেন?

গ. জেলা- বোর্ড কর্মকর্তার সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার গোবুরায়ের সাদৃশ্যগত দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সমাজের উপেক্ষিতদের মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব'– বিষয়টি উদ্দীপক ও 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অন্ধবধূ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[**কবি-পরিচিতি :** যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম ১৮৭৮ সালের ২৭শে নভেম্বর নদীয়া জেলার জামশেদপুর গ্রামে। পল্লি-প্রীতি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিমানসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিসর্গ-সৌন্দর্যে চিত্ররূপময়। রচনায় গ্রামবাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ উন্মোচনে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রাম-জীবনের অতি সাধারণ বিষয় ও সুখ-দুঃখ তিনি সহজ-সরল ভাষায় সহৃদয়তার সঙ্গে তাৎপর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে : *লেখা*, *রেখা*, *অপরাজিতা*, *নাগকেশর*, *বন্ধুর দান*, *জাগরণী*, *নীহারিকা* ও *মহাভারতী*। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি –
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল– মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল– কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই –
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

– অনেক দেরি? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া – বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে –
শ্যাওলা-পিছল – এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায় –
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা – দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে –
দেখবি তখন – প্রবাস কেমন লাগে?

'চোখ গেল' ওই চেঁচিয়ে হলো সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা–

জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার – ছাই!

কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কমত যে তার শোক।

'চোখ গেল'– তার ভরসা তবু আছে–
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!

টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি–
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা- সেই তো গৃহকোণ–
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে–
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

শব্দার্থ ও টীকা : ঠাকুরঝি – ননদ, স্বামীর বোন, শ্বশুরকন্যা। **মধুমদির বাসে** – মধুর গন্ধে মোহময় সুগন্ধে আচ্ছন্ন। **আকাশ-পাতাল** – নানা বিষয়, নানান ভাবনা-অনুভাবনা অর্থে ব্যবহৃত। **জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই ....** – একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভবের অসাধারণ এক জগৎ আলোচ্য অংশে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ধারণা ও অনুভবে এই অন্ধবধূ সমৃদ্ধ। সেই জ্ঞান ও অনুভব থেকে সে জেনে নিতে চায় ঋতুর বিবর্তন। **অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যাক** – অন্ধবধূ অনুভবঋদ্ধ মানুষ অর্থাৎ তার অনুভূতি শক্তি প্রখর। আত্মমর্যাদা বোধেও সে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে অন্ধ। এই অন্ধত্বের কষ্ট সে গভীরভাবে অনুভব করে। দীঘির ঘাটে যখন শেওলা পড়া পিছল সিঁড়ি জাগে, তখন সে পিছল খেয়ে জলে পড়ে ডুবে মরার আশঙ্কা প্রকাশ করে। সে এও অনুভব করে যে, ডুবে মরলে অন্ধত্বের অভিশাপ ঘুচত। কিন্তু কবিতাটির চেতনা থেকে মনে হয়, অন্ধবধূ নৈরাশ্যবাদী মানুষ নয়। জীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ আছে। **চোখ গেল** – পাখি বিশেষ। এই পাখির ডাক 'চোখ গেল' শব্দের মতো মনে হয়। **কাঁদার সুখ** – মানুষ দুঃখে কাঁদে, শোকে কাঁদে। কিন্তু কান্নার মধ্য দিয়ে তার দুঃখ-শোকের লাঘব ঘটে।

পাঠ-পরিচিতি : সমাজ দৃষ্টিহীনদের অবজ্ঞা করে। দৃষ্টিহীনেরা নিজেরাও নিজেদের অসহায় ভাবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়সচেতনতা দিয়ে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। পায়ের নিচে নরম বস্তুর অস্তিত্ব, কোকিলের ডাক শুনে নতুন ঋতুর আগমন অনুমান করা, শ্যাওলায় পা রেখে নতুন সিঁড়ি জেগে ওঠার কথা বোঝা দৃষ্টিহীন হয়েও সম্ভবপর। তাই দৃষ্টিহীন হলেই নিজেকে অসহায় না ভেবে, শুধুই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আপন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। বধূটি চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু অনুভবে সে জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কবিতাটিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সংবেদনশীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার জানা কোনো দৃষ্টিহীন মানুষের বিবরণ দাও।

২। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'অন্ধবধূ' কবিতায় কোন পাখির চেঁচিয়ে সারা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে?

ক. কাক খ. চোখ গেল

গ. কোকিল ঘ. শালিক

২। 'মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায়' বাক্যটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া খ. অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি

গ. সকলের কষ্ট দূর করা ঘ. স্বামীকে দায়মুক্ত করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসরীনের স্বামী চাকরির সুবাদে প্রবাসজীবন যাপন করছেন। দীর্ঘ সময় ধরে স্বামীর খোঁজ-খবর নেই, তাঁর সঙ্গে যারা বিদেশে থাকেন তারা মাঝে মাঝে আসেন-যান। কেবল তার স্বামীই যেন সবার থেকে আলাদা। নাসরীন স্বামীর জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষার দিন গোনে।

৩। উদ্দীপকের বক্তব্যে 'অন্ধবধূ' কবিতার বধূর কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. স্মৃতি কাতরতা খ. বিরহ কাতরতা

গ. প্রতিবন্ধকতা ঘ. আত্মমর্যাদা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। জীবনের এই স্বল্প সময়ের সমগ্র হিসাব চুকিয়ে, সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পরপারে চলে যেতে হয়। গৃহবধূ সুদীপা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, 'সুন্দর এই পৃথিবী, ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা, জোছনা ভরা রাত সব ছেড়ে আমাদের বিদায় নিতে হবে।

ক. 'মধুমদির বাসে' কথাটির অর্থ কী?

খ. 'কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে' পঙক্তিটি দ্বারা প্রকৃতির কোন রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'অন্ধবধূ' কবিতার যে বিশেষ দিকটিকে আলোকপাত করেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের বক্তব্যে 'অন্ধবধূ' কবিতার সমগ্র ভাবের প্রতিফলন ঘটেনি"– বিশ্লেষণ কর।

ঝরনার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[**কবি-পরিচিতি :** ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বি.এ. শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি কাব্যচর্চা করতেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের তিনি অনুরাগী ছিলেন। *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, কুহু ও কেকা, অভ্র-আবীর,* প্রভৃতি তাঁর মৌলিক কাব্য। তাঁর অনুবাদ- কাব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে : *তীর্থরেণু, তীর্থ-সলিল, ফুলের ফসল* প্রভৃতি। বিবিধ উপনিষদ ও কবির, নানক প্রমুখের রচনা এবং আরবি, ফার্সি, চীনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা ও গদ্য রচনা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ছন্দ নির্মাণে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য তিনি 'ছন্দের যাদুকর' বলে পরিচিত হন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।]

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।
শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝিঁর ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।
বিজন দেশ, কূজন নাই
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।
ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়,
কোন গিরির হিম ললাট
ঘামল মোর উদ্ভবে,
কোন পরীর টুটল হার
কোন নাচের উৎসবে।
খেয়াল নাই-নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,-খিলখিলাই-

বুলবুলির বোল সাধি।
বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কালসারের দল চরে,
শিং শিলায়–শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে।
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাঁট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই–
টিলার গায় ডালিম-ফাট।
শালিক শুক বুলায় মুখ
থল-ঝাঁঝির মখমলে,
জরির জাল আংরাখায়
অঙ্গ মোর ঝলমলে।
নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
'ফটিক জল।' হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক না সেই পাঁক ছেঁকে।
গরজ যার জল স্যাঁচার
পাতকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।
তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান–তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।
চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক।

শব্দার্থ ও টীকা : বিভোল– অচেতন, বিভোর, বিবশ, বিহ্বল। **বিজন**– নির্জন, জনশূন্য, নিভৃত। **কূজন**– পাখির ডাক। **ঝুম-পাহাড়**– নীরব পাহাড়, নির্জন পাহাড়। **হিম**– তুষার, বরফ। **শুক**– টিয়ে পাখি। **থল**– স্থল। **ঝাঁঝি**– একপ্রকার জলজ গুল্ম, বহুদিন ধরে জমা শেওলা। **মখমল**– কোমল ও মিহি কাপড়। **আংরাখা**– লম্বা ও ঢিলা পোশাকবিশেষ। **'ফটিক জল'**– চাতক পাখি। এই পাখি ডাকলে 'ফটিক জল' শব্দের মতো শোনা যায়। **বিলাই**– বিতরণ করি, পরিবেশন

করি (বিলোনো থেকে)। **তান**– সুর। **তরল শ্লোক**– লঘু বা হালকা চালের কবিতা। **চকোর**– পাখিবিশেষ। কবি-কল্পনা অনুযায়ী এই পাখি চাঁদের আলো পান করে। **চন্দ্রমা**– চাঁদের আলো। **উপল-ঘায়**– পাথরের আঘাতে।

পাঠ-পরিচিতি: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝরনার গান' কবিতাটি কবির *বিদায় আরতি* কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে অদ্ভুত ধ্বনিব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব ভাব। চঞ্চল পা পুলকিত গতিময়: স্তব্ধ পাথরের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন। নির্জন দুপুরে পাখির ডাকও শোনা যায় না। পাহাড় যেন দৈত্যের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে ভয় দেখায়! এত কিছুর মধ্যেও ঝরনার চঞ্চল ও আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে নেমে আসে সাদা জলরাশির ধারা। চমৎকার এর ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব। এই জলধারার যে সৌন্দর্য এবং অমিয় স্বাদ তা তুলনারহিত। গিরি থেকে পতিত এই অম্বুরাশি পাথরের বুকে আঘাত হেনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তা সত্যি মনোহর।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। কবিতাটিতে প্রকৃতির যেসব উপাদান ও প্রাণীর নাম বলা হয়েছে, তার একটি তালিকা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দুপুর-ভোর ঝরনা কার গান শুনতে পায়?

ক. ঝিঁঝির খ. পরীর
গ. বুলবুলির ঘ. শালিকের

২। 'একলা গাই একলা ধাই
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।'এ– বক্তব্যে ঝরনার কোন রূপটি ফুটে ওঠে?

ক. ছন্দময় খ. মনোহর
গ. ছুটে চলা ঘ. শঙ্কাহীন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
নারিন্দার বৃক্ষপ্রেমী বলরাম গড়ে তোলেন হাজার রকমের বৃক্ষের সমারোহে একটা উদ্যান যা বলধা গার্ডেন নামে পরিচিত। নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যই তাঁর এ উদ্যোগ। অনেকেই সেখানে এখন ভেষজ ঔষধের উপকরণ খোঁজেন।

৩। উদ্দীপকের বলরামের সাথে 'ঝরনার গান' কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে –

ক. চাতকের খ. ঝরনার
গ. বন-ঝাউয়ের ঘ. ফটিক জলের

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিসর্গকে হাতের মুঠোয় পুরে দেয়ার তাগিদ থেকে পলাশ সাহেব গড়ে তোলেন এক রমণীয় উদ্যান। বিস্তীর্ণ খোলা মাঠকে সুপরিকল্পিতভাবে তিনি গড়ে তোলেন। পুকুর, দীঘি, হাঁস, গাছপালা, ফুল, পাখির বিচিত্র সমারোহ সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। অনিন্দ্য সুন্দর এই প্রকৃতিকে শিল্পী তিলোত্তমা করে সাজিয়েছেন শুধুই নিজের খেয়ালে। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো গোষ্ঠীকে আনন্দ দান নয়, সৌন্দর্যই মুখ্য। বৈরী প্রকৃতি, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। সৃষ্টির আনন্দই তাঁকে এগিয়ে নিয়েছে এতটা পথ।

ক. ঝরণা কেমন পায়ে ছুটে চলে?

খ. 'শিথিল সব শিলার পর' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার মূল বক্তব্যকে কতটুকু ধারণ করে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

ছায়াবাজি

সুকুমার রায়

[**কবি-পরিচিতি :** শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর *আবোল-তাবোল*, *হ-য-ব-র-ল* প্রভৃতি অতুলনীয় রচনার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুকুমার রায় বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও শিশু সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পিতা। সুকুমার রায়ের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার মাশুয়া গ্রামে ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর। সুকুমার ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একদিকে বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ প্রকৌশলে উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন, অন্যদিকে ছড়া রচনা ও ছবি আঁকায় মৌলিক প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অদ্ভুত ক্লাব। নাম 'ননসেন্স ক্লাবের' পত্রিকার নাম ছিল *সাড়ে বত্রিশ ভাজা*। তাঁর রচনাগুলোও অদ্ভুত ও মজাদার। হাঁসজারু, বকচ্ছপ, সিংহরিণ, হাতিমি ইত্যাদি কাল্পনিক প্রাণীর নাম তাঁরই সৃষ্টি। বিখ্যাত *সন্দেশ* পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন সুকুমার রায়। আর একে কেন্দ্র করেই ঐ সময় সুকুমার রায়ের সাহিত্য প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন প্রধানত খেয়াল রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর।]

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা –
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানো না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি।
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে –
হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছু পিছু।
তোমরা ভাবো গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভুঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।

সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো–
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছগাছালি শেকড় বাকল সুদ্ধ সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুলতলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে !
পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি–
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

শব্দার্থ ও টীকা : আজগুবি– অদ্ভুত, অপূর্ব, অবিশ্বাস্য, বানানো। **গাত্রে–** গায়ে, শরীরে। **ভুঁয়ে–** ভূমিতে, মাটিতে। **অঘোর–** অচেতন, বেহুশ। **হপ্তা** – সপ্তাহ **মৌয়া–** মহুয়া গাছ, **ব্লটিং–** চোষ কাগজ।

পাঠ-পরিচিতি: সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি' ছড়া-কবিতাটি আবোল তাবোল থেকে সংকলন করা হয়েছে। তার ছড়ার অদ্ভুত জগতের মতো এখানেও অনেক আজগুবি কথা বলেছেন। যদিও তিনি বলছেন তা মোটেও আজগুবি নয়। তবুও কবির কথা বিশ্বাস হতে চায় না। সত্যি, ছায়ার সঙ্গে কি কুস্তি করা যায়? কবি বলছেন, রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, বকের ছায়া, চিলের ছায়া, হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া, শুকনো ছায়া, ভেজা ছায়া–এ রকম অসংখ্য ছায়া ধরে তিনি ব্যবসা ফেঁদেছেন। এই ছায়াবাজি বা ছায়ার ব্যবসা অবাস্তব নিশ্চয়। এই ছায়াগুলো অসুখেরও মহৌষধ! অনিদ্রা দূর করতে নিম ও ঝিঙের ছায়া; সর্দিকাশি সারাতে চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া; পঙ্গু লোকের নতুন করে পা জন্মাতে আমড়ার নোংরা ছায়া যদি খাওয়া যায় তা হলে এর কোনো তুলনা নেই! কবি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছায়া যত্নের সঙ্গে তুলে রাখেন; কিছু সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণের জন্য রাখেন। আসলে এটি একটি রূপক কবিতা। ছায়া এখানে শিল্পের অমরাত্মা হিসেবে বিবেচিত। চটুল ভাব ও পণ্ডশ্রমের ভেতরেও যে জীবনের গভীর সত্য নিহিত থাকতে পারে কবিতায় তা-ই প্রতিভাত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। 'ছায়াবাজি' কবিতায় যে বিভিন্ন প্রকার ছায়ার কথা বলা হয়েছে তার বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'ছায়াবাজি' কবিতায় কবি কিসের ব্যবসা করেন?

ক. বইয়ের　　খ. গাছের
গ. ঔষধের　　ঘ. ছায়া ধরার

২। 'ধামায় চেপে ধপাস করে ধরবে তারে ঠেসে'। এ বাক্যে কবি মানব মনের কোন অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন?

ক. সাহস　　খ. ভয়
গ. কল্পনা　　ঘ. হতাশা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাস্তার ধারে শিশি-বোতলের পসরা সাজিয়ে বসেছে কবিরাজ করম আলী। হারমোনিয়ামে গান ধরেছে রহম আলী। ইত্যবসরে অনেক লোক জমা হয়েছে সেখানে। গানের ফাঁকে ফাঁকে ঔষধের গুণ-গান গাইছে। ব্যাকুল জনতা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে কবিরাজের ঔষধের জন্য। তাদের বিশ্বাস এ মহৌষধ সেবনে সমস্ত রোগব্যাধি থেকে তারা মুক্তি পাবে।

৩। উদ্দীপকের সাধারণ জনতার আচরণ 'ছায়াবাজি' কবিতার সাধারণ মানুষের কোন দিকটিকে সমর্থন করে?

ক. অন্ধ অনুকরণ　　খ. পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
গ. গভীর বিশ্বাসবোধ　　ঘ. হুজুগে নাচা

সৃজনশীল প্রশ্ন

এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।
কানের খোঁজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাঁতার বিলে

* * *

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হলো শ্রম।

ক. চিল কখন আকাশপথে ঘোরে?
খ. ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গা ব্যথা হলো কেন?
গ. উদ্দীপকে চিলের পেছনে ছোটার সঙ্গে 'ছায়াবাজি' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি পণ্ড হলো শ্রম – এ বক্তব্যের মাঝেই 'ছায়াবাজি' কবিতার মূলভাব নিহিত" – যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

জীবন বিনিময়

গোলাম মোস্তফা

[**কবি পরিচিতি :** গোলাম মোস্তফা যশোর জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেই ইসলামি ঐতিহ্য থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্য : *রক্তরাগ*, *খোশরোজ*, *বুলবুলিস্তান*, উপন্যাস: *ভাঙ্গাবুক*, *রূপের নেশা*, *এক মন এক প্রাণ*; জীবনী : *বিশ্বনবী*, *মরুদুলাল*; অনুবাদ : *কালামে ইকবাল*, *আল কুরআন*, *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া ইত্যাদি*। তিনি ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর-
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।

রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

তবু তাঁর সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাক হায়,
যত দিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়-
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়।

শুধাল বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি,
'বল বল আজি সত্যি করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে নাকি?'

নতমস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোন কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাঁদের সে নিষ্ঠুর নীরবতা
শেলসম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!

হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন- 'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।'

শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিক মানি-
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে ধন জানি তাহা আমি জানি।'
এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনারত হাতদুটি তাঁর, নয়নে অশ্রুজল।

কহিল কাঁদিয়া- 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।'

স্তব্ধ-নীরব গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্বরাণী,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি।

সহসা বাবর ফুকারি উঠিল - 'নাহি ভয় নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লাহ্ যে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে - মরিবে না নিশ্চয়।'

ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ
নিরাশ হৃদয় সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,
তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস।

সেইদিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখাদিল বাবরের,
হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের,
নতুন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের।

মরিল বাবর - না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোন ক্ষয়,
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!

শব্দার্থ ও টীকা :

বিনিময়- বদল। **নিদ-** ঘুম। **ভিষকবৃন্দ-** চিকিৎসকগণ। **বাদশাজাদা-** সম্রাটের পুত্র, এখানে হুমায়ুন। **শেলসম-** তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো। **শঙ্কা-** ভয়। **অস্তরবি-** অস্তগামী সূর্য। **দৃপ্ত-** উদ্ধত (এখানে উদ্দীপিত অর্থে ব্যবহৃত)।

সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠধন –প্রত্যেক মানুষের কাছে নিজের জীবনই শ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে বিবেচ্য। **ধেয়ানে-** ধ্যানে। **সুপ্তিমগ্ন-** ঘুমে অচেতন। **ফুকারি-** চিৎকার করে। **কবুল-** স্বীকার, গৃহীত।

তিমির রাতের তোরণে উষার পূর্বাভাস- ভোরের আগমন আঁধার রাতের অবসান ঘোষণা করে। এখানে হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা তিমির রাত এবং রোগমুক্তির লক্ষণকে উষার পূর্বাভাস বলা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি :

'জীবন বিনিময়' কবিতাটি গোলাম মোস্তফার *বুলবুলিস্তান* কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে।

কবিতাটিতে পিতৃস্নেহের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। পিতার স্নেহ-বাৎসল্যের কাছে মৃত্যুর পরাজয় এই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। মোগল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এক দরবেশ এসে জানালেন যে, সম্রাট যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন দান করেন তবেই তাঁর পুত্র জীবন লাভ করতে পারেন। সম্রাট বাবর উপলব্ধি করলেন, নিজের প্রাণের চেয়ে আর বেশি প্রিয় কিছু নেই। তিনি বিধাতার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সে ধনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এভাবে পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটল। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতার অপরিসীম ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কবি হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা বোঝানোর জন্য কোন উপমাটি ব্যবহার করেছেন?

ক. জীবন-প্রদীপ
খ. অস্তরবির প্রায়
গ. নিষ্ঠুর নীরবতা
ঘ. উষার পূর্বাভাস

২. 'তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. হুমায়ুনের রোগমুক্তির লক্ষণ
খ. বাবরের শান্ত-অচঞ্চল মন
গ. বাবরের প্রার্থনা কবুল হওয়া
ঘ. বাবরের মৃত্যুশয্যা গ্রহণ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পত্রিকায় প্রকাশ : বরিশাল যাবার পথে লঞ্চ ডুবিতে পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে পিতার মৃত্যু।

৩. উদ্দীপকে 'জীবন বিনিময়' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. সন্তান বাৎসল্য
ii. অপত্যস্নেহ
iii. পিতার আত্মত্যাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. 'জীবন বিনিময়' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির সঙ্গে উদ্দীপকের ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়
খ. পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়
গ. হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের
ঘ. মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাবার সঙ্গে ঢাকায় বেড়াতে এসে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে উৎপল ও তার বাবা। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা উৎপলকে আঘাত করতে এলে বাবা তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ছিনতাইকারীর ছুরিতে রক্তাক্ত হন। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব যখন উৎপলকে জানান যে, এই মুহূর্তে রক্ত না হলে রোগী বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎপল তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় রক্ত দিয়ে বাবাকে আশঙ্কামুক্ত করেন।

ক. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কোনটিকে 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন' বলা হয়েছে?

খ. কবি 'জীবন বিনিময়' কবিতায় নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলেছেন কেন?

গ. উৎপলকে সরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের পিতার মাঝে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের যে পরিচয় মেলে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "ভাবগত ঐক্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহের সমার্থক নয়" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

[**লেখক-পরিচিতি :** কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সালে (২৪শে মে ১৮৯৯) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিন্ধুহিন্দোল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা* ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। *যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী* তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে (বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।]

গাহি সাম্যের গান –
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ–
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমিররাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, – অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'

তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা?'
ভুখারি কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল—'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!'
কোথা চেঙ্গিস, গজনি মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!

শব্দার্থ ও টীকা : সাম্য – সমতা। **মহীয়ান**– অতি মহান, **ঠাকুর** – দেবতা। **ক্ষুধার ঠাকুর** – ক্ষুধার্ত মানুষকে দেবতাজ্ঞান করা হয়েছে। যেমন 'অতিথি নারায়ণ'। **বর** – আশীর্বাদ। কারো কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয়। **পান্থ** – পথিক। **ভুখারি** – ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। **ক্ষুধার মানিক জ্বলে** – ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জঠরজ্বালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **ফুকারি** – চিৎকার করে। **আজারি** – রুগ্‌ণ, ব্যথিত। **তেরিয়া** – উদ্ধতভাবে, উগ্রভাবে, ক্রুদ্ধভাবে। **গো-ভাগাড়** – মৃত গরু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। **পুরুত** – পুরোহিত, পূজার্চনা পরিচালনার মুখ্য ব্যক্তি। **চেঙ্গিস** – চেঙ্গিস খান। **গজনি মামুদ** – গজনির সুলতান মাহমুদ। তিনি সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালান। এখানে তাঁকে উপাসনালয়ের ভণ্ড কর্তাদের ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। **কালাপাহাড়** – প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ, কারো কারো মতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক দেবালয় ধ্বংস করেছেন। যারা পবিত্র উপাসনালয়ের দরোজা বন্ধ করে, তাদের ধ্বংসের জন্য কবিতায় কালাপাহাড়কে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি : কাজী নজরুল ইসলামের *সাম্যবাদী* কাব্য থেকে মানুষ কবিতাটি সম্পাদনা করে সংকলিত হয়েছে। পৃথিবীতে নানা বর্ণ, ধর্ম, গোত্র আছে। বিভিন্ন ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক ধর্মগ্রন্থও আছে। মানুষ ধর্মগ্রন্থগুলোকে খুবই শ্রদ্ধা করে, ধর্মের জন্য জীবনবাজিও রাখে। কিন্তু নিরন্ন অসহায়কে অনেক সময় তারা সামর্থ্য থাকার পরও অন্ন দান করে না। মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের মোল্লা সাহেবরাও অনেক সময় এ রকম হৃদয়হীন কাজ করেন। মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু যে হতে পারে না, ধর্মও সে কথাই বলে। অথচ ধর্মকে ব্যবহার করে অনেকে স্বার্থ হাসিল করে এবং মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা করে; যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কবিতায় সে ভাবটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাণিজগতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব– আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি কার জয়গান গেয়েছেন ?

ক. মানুষের খ. সাম্যের
গ. শ্রমিকের ঘ. তারুণ্যের

২। 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়'–এ বক্তব্যে ভুখারির কোন মনোভাব প্রকাশ পায়?

ক. প্রতিবাদী খ. অসহায়ত্ব
গ. ফরিয়াদ ঘ. ক্ষোভ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সামাদ মিয়া একজন আদম বেপারি। সম্প্রতি তিনি গ্রামে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে লোক পাঠানোর কথা বলেন। আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনেকেই ভিটেমাটি, হাল-গরু বিক্রি করে তার হাতে টাকা দেয়। একদিন শোনা যায় সামাদ মিয়া গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন।

৩। উদ্দীপকের সামাদ মিয়ার সঙ্গে 'মানুষ' কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. পূজারী খ. ভুখারি
গ. মোল্লা সাহেব ঘ. গজনি মামুদ

সৃজনশীল প্রশ্ন

আজম সাহেব কুসুমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হলে জেলা প্রশাসন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য নানাবিধ ত্রাণসামগ্রী আসে। ত্রাণ সাহায্য নিতে আসা প্রত্যেককে আজম সাহেব নিজ হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে খুশি মনে বাড়ি ফেরেন।

ক. 'ক্ষুধার ঠাকুর' কথাটির অর্থ কী?

খ. 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' – কেন?

গ. আজম সাহেব 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত যে চরিত্রের বিপরীত সত্তা তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত ভণ্ডদের মানসিকতা পরিবর্তনে আজম সাহেবের মতো ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম– মতামতটি বিশ্লেষণ কর।

উমর ফারুক

কাজী নজরুল ইসলাম

তিমির রাত্রি-'এশা'র আজান শুনি দূর মসজিদে।
প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!

আমির-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন।
তকবির শুনি, শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই-উঠিয়াছে কি-রে গগনে মরুর শশী?
ও-আজান, ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান?

আবার লুটায়ে পড়ি।
"সেদিন গিয়াছে"-শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।
উমর! ফারুক! আখেরী নবির ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহ্বান নয় - রূপ ধরে এস - গ্রাসে অন্ধতা - রাহু!
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া-জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু আঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
ইসলাম-সে তো পরশ-মানিক তাকে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর-
মোর পরে যদি নবি হত কেউ, হত সে এক উমর।'

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক'নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে।

শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।

হেরি পশ্চাতে চাহি-
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা বলেছে শত্রু শেষে-
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে!
হায় রে, আধেক ধরার মালিক আমির-উল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দু খানা শুকনো 'খবুজ' রুটি
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু তিন মুঠি।
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি!
মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।
কিছুদুর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, "ভাই
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে,
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।"

...ভৃত্য হস্ত চুমি
কাঁদিয়া কহিল, 'উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি?

খলিফা হাসিয়া বলে,
'তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে।
রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ যে দিন কহিবে, 'উমর! ওরে
করে নি খলিফা, মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে।'

কী দিব জওয়াব কী করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই।
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু। মোর অধিকার নাই।
আরাম সুখের, - মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কিনা,
কী গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি' বিশ্ববীণা।
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব-
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব।'

* * * * * * * * * * * * * *

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ-সালারে, ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

* * * * * * * * * * * * * *

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে তব মহত্ত্ব-কথা-সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়।
শুনিয়া সকল-কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে, 'এ সব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের' পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।'

কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, 'বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি'-চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে!

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি কো অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে!
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি-
'অপরাধ করে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী।'

আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,
রোদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে।
হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ-পরিচিতি: উমর ফারুক কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের *জিঞ্জীর* কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা)-এর জীবনাদর্শ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, মানবিকতা এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খলিফা উমর (রা) ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা এবং সাম্যবাদী আদর্শের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। নিজ ভৃত্যকেও তিনি তাঁর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি। ন্যায়ের আদর্শ সমুন্নত রাখতে তিনি আপন সন্তানকে কঠোরতম শাস্তি দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি ছিলেন আমির-উল-মুমেনিন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব বলে বিশ্বাস করেই বলেছিলেন, তাঁর পরে যদি কেউ নবি হতেন, তাহলে তিনি হতেন উমর। মহৎপ্রাণ ও আদর্শ মানব চরিত্র অর্জনের জন্য উমর ফারুককে কবি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা:

তাপ- উত্তাপ। **হস্ত**- হাত। **পেরেসান**- বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। **আমির উল-মুমেনিন**- বিশ্বাসীদের নেতা, এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে মুসলামানদের ধর্মীয় প্রধান ও রাষ্ট্রীয় নেতা হজরত উমর (রা) কে। **মুয়াজ্জিন**- যিনি আজান দেন। **তকবির**- 'আল্লাহ' ধ্বনি বা রব। **আখেরি**- শেষ। **পরশমণি**- স্পর্শমণি, যার ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়। **তখত**- সিংহাসন। **সাইমুম**- শুকনো উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী প্রবল হাওয়া- বিশেষত মরুভূমির হাওয়া। **মশক**- পানি বইবার চামড়ার থলে। **দোর্রা**- চাবুক। **চীর**-ছিন্ন বস্ত্র। **পিরান**- জামা। **নান্দী**- স্তুতি। কাব্যপাঠ বা নাটকের শুরুতে ছোট করে মঙ্গলসূচক প্রশস্তি পাঠ। **শমসের**- তরবারি। **দস্ত**-হাত। **পেরেশান**- বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

উমর ফারুক- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর খেলাফতের সময়কাল দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা আরব সাম্রাজ্য থেকে মিশর ও তুর্কিস্তানের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। একজন ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক ও গণতন্ত্রমনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চির অম্লান। 'ফারুক' হজরত উমরের উপাধি। যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাঁকেই 'ফারুক' বলা হয়। হজরত উমর (রা.) ছিলেন সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক।

'তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন'- হজরত উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নামাজের জন্য প্রকাশ্য আজান দেয়ার রীতি ছিল না। কোরেশদের ভয়ে মুসলমানরা উচ্চরবে আজান দিতে সাহস পেত না। উমর ছিলেন কোরেশ বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠবীর। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন প্রকাশ্যে আজান দিতে আর কোনো বাধা রইল না। তাই আজানের সঙ্গে যে উমরের স্মৃতি বিজড়িত সে কথা অনেক মুয়াজ্জিন জানে না।

জেরুজালেম- ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের একটি প্রাচীন শহর জেরুজালেম।

আবু শাহামা- হজরত উমরের পুত্র। মদপানের অপরাধে খলিফা তাকে ৮০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন এবং নিজেই বেত্রাঘাত করেন। বেত্রাঘাতের ফলে আবু শাহমার মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমিরুল মুমেনিন' অর্থ কী?

ক. বিশ্ববাসীর নেতা খ. বিশ্বাসীদের নেতা
গ. বিশ্বনেতা ঘ. মুসলিম খলিফা

২. 'মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী' পঙ্ক্তিতে উমরের কোন গুণ প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সাম্যবাদিতা
খ. বিচক্ষণতা
গ. ন্যায়পরায়ণতা
ঘ. অনাড়ম্বরতা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমাজকর্মী মালেকা বানু তার বাসার কাজের মেয়েটাকে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি আচার-আচরণের দিক থেকেও নিজেদের সন্তানের মতোই দেখেন।

৩. উদ্দীপকের মালেকা বানুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হযরত উমর চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো-

i. মানবতা
ii. সাম্য
iii. বিচক্ষণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত দিকটি 'উমর ফারুক' কবিতার কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি
খ. উর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে
গ. ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি
ঘ. পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজী পাড়ার চেয়ারম্যান আব্বাস আলী। একবার তার নির্বাচনি এলাকার অধিকাংশ মানুষ ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু বানভাসি মানুষ একদিনও চেয়ারম্যান সাহেবের দেখা পেলেন না। কারণ তিনি নাকি ঢাকায় জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। অসহায় লোকগুলো খোলা আকাশের নিচে বোবা চাউনি মেলে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়। বন্যা শেষে একদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চেয়ারম্যানের বাগানবাড়ি তল্লাশি করে থেকে ত্রাণের প্রচুর টিন ও খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করে।

ক. 'উমর ফারুক' কবিতা কোন কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে?
খ. হজরত উমরকে 'আমিরুল মুমেনিন' বলার কারণ কী?
গ. চেয়ারম্যান আব্বাস আলী যেদিক থেকে হজরত উমরের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আব্বাস আলী চেয়ারম্যানকে উমরের মতো আদর্শ মানুষ হতে হলে কী কী করতে হবে 'উমর ফারুক' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

সেইদিন এই মাঠ

জীবনানন্দ দাশ

[**কবি-পরিচিতি :** জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন একজন স্বভাবকবি। জীবনানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত আধুনিক জীবনচেতনার কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ : *ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, কবিতার কথা, রূপসী বাংলা, মাল্যবান* ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।]

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি–
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন –
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত বাতি – ভিজে গন্ধ – মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;
এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

শব্দার্থ ও টীকা : সেইদিন এই মাঠ ... কবে আর ঝরে – জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য তাঁর কবিতার মৌলিক প্রেরণা। তিনি জানেন বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলবে না। তিনি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্ন-সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। আলোচ্য অংশে কবি প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যকে গভীর তৃপ্তি ও মমত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। **আমি চলে যাব বলে ... লক্ষ্মীটির তরে** – পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক মানুষকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কিন্তু শিশিরের জলে চালতা ফুল ভিজে যে রহস্যময় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তে তার কোনো শেষ নেই। আর সেই শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকবে অনন্তকালব্যাপী। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাশ্বতরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে লক্ষ্মীপেঁচাটির মমত্বের অনুভাবনাও ধরা দিয়েছে অসাধারণ এক তাৎপর্যে। **এশিরিয়া ধুলো আজ ...** – মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। এশিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আস্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনই শেষ হয় না। কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বিস্ময়কর নিপুণতায় উপস্থাপন করেছেন।

পাঠ-পরিচিতি : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা* কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। সভ্যতা একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু অন্যদিকে চলে তার বিনির্মাণ। মরণশীল ব্যক্তিমানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিতে থাকে চিরকালের ব্যস্ততা। মাঠে থাকে চঞ্চলতা, চালতাফুলে পড়ে শীতের শিশির, লক্ষ্মীপেঁচকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মঙ্গলবার্তা, খেয়া নৌকা চলে নদীনালাতে–অর্থাৎ কোথাও থাকে না সেই মৃত্যুর রেশ। ফলে মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু রহিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতে সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই, মানুষের স্বপ্নেরও মরণ নেই। গভীর জীবনতৃষ্ণা নিয়ে এই সত্যই কবিতাটিতে অনুভূত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। খেয়া নৌকায় পারাপারের বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত ফুলের নাম কী?

ক. গোলাপ খ. শিউলি
গ. চালতা ঘ. কদম

২। 'আমি চলে যাব'– কবি কোথায় চলে যাওয়ার কথা বলেছেন?

ক. গ্রামে খ. শহরে
গ. পরপারে ঘ. বিদেশে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
তখন আমায় নাই বা তুমি ডাকলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা মনে রাখলে।

৩। উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সৌন্দর্য খ. ঐতিহ্য
গ. ঐশ্বর্য ঘ. আনন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি চিরকালের নবীনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অপু, দুর্গা এবং আরও অনেকে সেই চিরন্তন প্রকৃতির সন্তান। এরা যায়-আসে—থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি চিরকালই নানা রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে বিরাজমান থাকে।

ক. কী ছাই হয়ে গেছে?

খ. 'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের প্রকৃতি জানার সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতায় উল্লেখিত সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

যাব আমি তোমার দেশে

জসীমউদ্‌দীন

[**কবি পরিচিতি :** জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের পল্লিপ্রকৃতি ও মানুষের সহজ স্বাভাবিক রূপটি তুলে ধরেছেন। পল্লির মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। পল্লির মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ-বেদনা ও বিরহ-মিলনের এমন আবেগ-মধুর চিত্র আর কোনো কবির কাব্যে খুঁজে পাওয়া ভার। এ কারণে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর রচিত 'কবর' কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে রয়েছে *নক্সী-কাঁথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট, রাখালী, বালুচর, হাসু, এক পয়সার বাঁশি, মাটির কান্না* ইত্যাদি। তাঁর *নক্সী-কাঁথার মাঠ* কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। *চলে মুসাফির* তাঁর ভ্রমণকাহিনী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৩ই মার্চ কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

পল্লি-দুলাল, ভাই গো আমার যাব আমি-তোমার দেশে,
আকাশ যাহার বনের শীষে দিক-হারা মাঠ চরণ ঘেঁসে।
দূর দেশীয় মেঘ-কনেরা মাথায় লয়ে জলের ঝারি,
দাঁড়ায় যাহার কোলটি ঘেঁসে বিজলী-পেড়ে আঁচল নাড়ি।
বেতস কেয়ার বনে যেথায় ডাহুক মেয়ে আসর মাতায়,
পল্লি-দুলাল ভাই গো আমার, যাব সেথায়।
তোমার দেশে যাব আমি, দীঘল বাঁকা পন্থখানি,
ধান কাউনের ক্ষেতের ভেতর সরু সুতোর আঁচড় টানি,
গিয়াছে সে হাবা মেয়ের এলো মাথার সিঁথির মতো
কোথাও সিঁধে কোথাও বাঁকা গরুর গায়ের রেখায় ক্ষত।
গাজন-তলির মাঠ পেরিয়ে শিমুলডাঙা বনের বায়ে:
কোথাও গাঁয়ের রোদ মাখিয়া ঘুম-ঘুমায়ে গাছের ছায়ে।

* * *

তাহার পরে মুঠি ছড়িয়ে দিয়ে কদম-কলি,
কোথাও মেলে বনে পাতা গ্রাম্য মেয়ে যায় যে চলি।
সে পথ দিয়ে যাব আমি পল্লি-দুলাল তোমার দেশে,
নাম-না জানা ফুলের সুবাস বাতাসেতে আসবে ভেসে।

তোমার সাথে যাব আমি, পাড়ার যত দস্যি ছেলে,
তাদের সাথে দল বাঁধিয়া হেথায় সেথায় ফিরব খেলে।
ধল-দীঘিতে সাঁতার কেটে আনব তুলে রক্ত-কমল,
শাপলা লতায় জড়িয়ে চরণ ঢেউ-এর সাথে খাব যে দোল।
হিজল-ঝরা জলের ছিটায় গায়ের বরণ রঙিন হবে
খেলবে দীঘির ঝিলিমিল মোদের লীলা কালোৎসবে।
তোমার দেশে যাব আমি পল্লি-দুলাল ভাই গো সোনার,
সেথায় পথে ফেলতে চরণ লাগবে পরশ এই মাটি-মার।
ডাকব সেথা পাখির ডাকে, ভাব করিব পাখির সনে,
অজান ফুলের রূপ দেখিয়া মানবো তারে বিয়ের কনে।
চলতে পথে ময়না কাঁটায় উত্তরীয় জড়িয়ে যাবে,
ইটেল মাটির হোঁচট লেগে আঁচল হতে ফুল ছড়াবে।
পল্লি-দুলাল, যাব আমি- যাব আমি তোমার দেশে,
তোমার কাঁধে হাত রাখিয়া ফিরবো মোরা উদাস বেশে।
বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখব মোরা সাঁজ-বাগানে,
ফুল ফুটেছে হাজার রঙের মেঘ-তুলিকার নিখুঁত টানে।
গাছের শাখা দুলিয়ে আমি পাড়ব সে ফুল মনের আশে,
উত্তরীয় ছড়িয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো বনের পাশে।
যে ঘাটেতে ভরবে কলস গাঁয়ের বিভোল পল্লিবালা,
সে ঘাটেরি এক ধারেতে আসবো রেখে ফুলের মালা।
দীঘির জলে ঘট বুড়াতে পথে-পাওয়া মাল্যখানি,
কুড়িয়ে নিয়ে ভাববে ইহা রেখে গেছে কেই না জানি।
চেনে-না তার হাতের মালা হয়ত সে-বা পরবে গলে,
আমরা দু'জন থাকব বসে ঢেউ দোলা সেই দীঘির কোলে।
চার পাশেতে বনের সারি এলিয়ে শাখার কুন্তল-ভার,
দীঘির জলে ঢেউ গণিবে ফুল শুঁকিবে পদ্ম-পাতার।
বনের মাঝে ডাকবে ডাহুক, ফিরবে ঘুঘু আপন বাসে,
দিনের পিদীম ঢুলবে ঘুমে রাত জাগা কোন্ ফুলের বাসে।
চার ধারেতে বন জুড়িয়া রাতের আঁধার বাঁধবে বেড়া,
সেই কুহেলীর কালো কারায় দীঘির জলও পড়বে ঘেরা।

শব্দার্থ ও টীকা : পল্লি-দুলাল- পল্লি মায়ের আদরের ছেলে। পল্লির অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশে যে ছেলে হয়েছে, কবি তাকে পল্লি দুলাল বলে সম্বোধন করেছেন। **শীর্ষে-** শীর্ষে, মাথার উপরে। **বেতসবন-** বেতবন। **ধীঘল-** দীর্ঘ। **পন্থ-** পথ। **দস্যি-** দুষ্ট, দুরন্ত। **ধল-দীঘি-** মস্ত বড় দীঘি। **শাখী-** বনের বৃক্ষ। **উত্তরীর-** চাদর, গায়ের কাপড়। **বুড়াতে-** ভরতে। **কুন্তল-** চুল। **বাসে-** গন্ধে। **ফুলের বাসে-** ফুলের সুগন্ধে। **কুহেলী-** কুয়াশা। **অন্বেষণ-** অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা।

পাঠ-পরিচিতি :

'যাব আমি তোমার দেশ' কবিতাটি কবি জসীম উদ্‌দীনের *ধানক্ষেত* কাব্য থেকে সংকলিত। এই কবিতায় কবি আদরের পল্লি দুলালের দেশে অর্থাৎ পল্লি গ্রামে যেতে চেয়েছেন।

পল্লি গ্রাম, প্রকৃতি যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। তার বনের শীর্ষে আকাশ, পায়ের কাছে দিক-হারা মাঠ। সেখানে বেত-কেয়ার বনে ডাহুক ডাকে। সেখানে ধান-কাউনের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু সুতার মত দীর্ঘ বাঁকা পথ গেছে। সেই পথে গাঁয়ের মেয়ে কদম কলি ছড়িয়ে হেঁটে চলে। কবি সেই পথে যাবেন পল্লি-দুলালের দেশে। তারপর পাড়ার দস্যি ছেলেদের সাথে খেলা করবেন। ধল দীঘিতে সাঁতার কেটে রক্ত কমল তুলে আনবেন। মাটিতে পা ফেলে তিনি হাঁটবেন। পাখির সাথে ডাকবেন। অজানা ফুলের রূপ দেখে মুগ্ধ হবেন।

পল্লি-দুলালের কাঁধে হাত রেখে উদাস বেশে তিনি ঘুরে বেড়াবেন। গাছের শাখা দুলিয়ে হাজার রঙের ফুল তুলবেন। যে ঘাটে পল্লিবালারা কলসী ভরে পানি নেয়, সেই ঘাটের পাশে রেখে আসবেন ফুলের মালা। তারপর সন্ধ্যা নামবে। চারদিকে আঁধার আসবে ঘনিয়ে। নিরালা নিঝুম অন্ধকারে কবি পল্লি দুলালের সাথে পল্লি মায়ের অপরূপ সৌন্দর্য অন্বেষণ করবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কবি কোথায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন?

ক. নিজ গ্রামে   খ. বিদেশে

গ. পল্লিগ্রামে   ঘ. শহরে

২. কবি কাদের সাথে দল বেঁধে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন?

ক. চাষির ছেলেদের   খ.দস্যি ছেলেদের

গ. রাখাল ছেলেদের   ঘ. খেলার সাথিদের

৩. 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতার পঙক্তিতে কবি উল্লেখ করছেনে–

i. ধানক্ষেত-কাউনের ক্ষেতের ভেতর সরু সুতোর আঁচড় টানি

ii. চলতে পথে ময়না কাঁটার উত্তরীয় জড়িয়ে যাবে

iii. বনের পাতার ফাঁকে দেখব মোরা সাঝ-বাগানের

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

৪. 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতায় কবি গায়ের বরণ রঙিন করতে চায়–

i. ধল-দীঘিতে সাঁতার কেটে

ii. হিজল ঝরা জলের ছিটায়

iii. ঝিলিমিলি ঢেউ খেলিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শহরের দুই বন্ধু শফিক ও আশিক পরিকল্পনা করে এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের গ্রামের বন্ধু শাহেদের বাড়িতে যাবে। তারা কখনো গ্রাম দেখেনি। বইয়ের পাতায় আর টেলিভিশনে দেখেছে বহুবার, ভালোও লেগেছে কিন্তু সশরীরে যাওয়া হয়নি কখনো। তাই এ সুযোগ তারা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। তাদের ভালোলাগা আরো শতগুণ বেড়ে গেছে শাহেদ যখন নিজ গ্রামের বন-বনানী, ফুল, পাখি, দীঘি, শাপলা, মেঠো পথ, ছেলেমেয়েদের দুরন্তপনা ইত্যাদির নয়নাভিরাম বর্ণনা তাদের শুনিয়েছে।

ক. 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতাটি কে লিখেছেন?

খ. 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতায় গ্রাম্য মেয়ে কেমন করে চলে?

গ. উদ্দীপকে শহুরে দুই বন্ধুর গ্রাম দেখার যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন কবিতায় এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে শাহেদ তার গ্রামের যে নয়নাভিরাম বর্ণনা করেছেন 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতার আলোকে তার বর্ণনা দাও।

একটি কাফি

বিষ্ণু দে

[**কবি-পরিচিতি :** বিষ্ণু দে ১৯০৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট পলস্‌ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. সম্মান এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম কবি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিষ্ণু দে পুরাণ ও ঐতিহ্যের ব্যবহারে তাঁর কবিতাকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য: *উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালি, সাতভাই চম্পা, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ* ইত্যাদি। সাহিত্য আকাদেমি ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে বিষ্ণু দে মৃত্যুবরণ করেন।]

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,
পলাশে আর আমের ডালে ডালে
সবুজ মাঠে মাঝবয়সী লালে
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায় :
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।

বিভোল মনে অবাক চেয়ে থাকে
সারা দুপুর হেলাফেলার হীরায়,
উদাস মন হাওয়ার পাকে পাকে
ঘুঘুর ডাকে গ্রামের ফাঁকা ক্ষেতে
মিলিয়ে দেয় দুস্থতার পাতক,

বিকাল তাই সন্ধ্যা-রঙে মেতে
শেষ, যে শেষ সারাদিনের পরে
একটি গানে গহন স্বাক্ষরে।
জানো কি সেই গানের আমি চাতক?

শব্দার্থ ও টীকা : আমারও মন ... মুক্তি সুখে জিরায় – মানবমনে প্রকৃতির শাশ্বত আবেদন আছে। শহরে নগরে যেখানে সে বসবাস করুক না কেন, তার অবচেতনে লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির চিরায়ত আহ্বান। আলোচ্য অংশে কবি হৃদয়ও পালিয়ে আনন্দ পায় চৈত্রের ঠা-ঠা রোদের আম-কাঁঠালের ডালে ডালে, সবুজ মাঠে মাঠে। **মাঝবয়সী লাল** – গাছ-পালার বয়স্ক পাতার রং বোঝাতে কবি এই চিত্রকল্পটি ব্যবহার করেছেন। **বিভোল**– অভিভূত, আত্মহারা, মুগ্ধ। **দুস্থতার পাতক** – শারীরিক ও মানসিক অশান্তি দূর করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **চাতক**– একপ্রকার পাখি। কবি কল্পনায় চাতক পাখি বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য পানি পান করে না।

পাঠ-পরিচিতি : বিষ্ণু দে-র 'একটি কাফি' কবিতাটি কবির *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে। এটি একটি প্রকৃতিলগ্ন কবিতা। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি, এর মাঠ-ঘাট, মানুষ অতুলনীয় এবং বিশেষ আবেদনময়। যে জন এই নিসর্গ-প্রকৃতি থেকে নগরের আহ্বানে সেখানে স্থায়ী বসতি গড়েন, তাকেও তার এককালের পল্লিপ্রকৃতি বারবার আকর্ষণ করে; ষড়ঋতু তার মনে আবেগের রংধনু তোলে। এর শাশ্বত কারণ হলো, মানুষ স্বভাবত তার নিজভূমের প্রতি ঋণী হয়। কবি নিজেও তৃষ্ণার্ত চাতক পাখির মতো তাঁর নিজভূমের পল্লিপ্রকৃতির জন্য অপেক্ষমাণ। কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতাই উন্মোচিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। গ্রামবাংলার ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবির মন কতক্ষণ মুক্তি সুখে জিরায়?

ক. দুঘণ্টা খ. দুদণ্ড

গ. দুদিন ঘ. দুযুগ

২। 'মাটির কাছে সব মানুষ খাতক' কেন?

ক. মাটি থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়

খ. মাটি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না

গ. মাটি মায়ের মতই অনন্য

ঘ. মাটি ছাড়া আমরা অস্তিত্বহীন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

পউষের বেলা শেষ পরি, জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ করে তোলে মশ্‌গুল
ঝিঙেফুল ॥

৩। উদ্দীপকের সঙ্গে 'একটি কাফি' কবিতার মিল রয়েছে –

i. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে

ii. স্বদেশ-প্রেমে

iii. ব্যক্তিগত অনুভূতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের মধ্যে 'একটি কাফি' কবিতার কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে?

ক. সৌন্দর্যবোধ খ. আত্মতৃপ্তি

গ. গভীর আবেগ ঘ. প্রকৃতিপ্রীতি

সৃজনশীল প্রশ্ন

দিনের আলোক-রেখা মিলায়েছ দূরে
নেমে আসে সন্ধ্যা ধীরে ধরণীর পুরে।
তিমির ফেলেছে ছায়া,
ঘিরে আসে কাল মায়া,
প্রান্তর-কানন-গিরি পল্লি বাটমাঠ
একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

ক. 'দুস্থতার পাতক' কথাটির অর্থ কী?

খ. 'জানো কি সেই গানের আমি চাতক?' এ কথাটি দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটির সঙ্গে 'একটি কাফি' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'একটি কাফি' কবিতার মূলভাব প্রকাশে কতটুকু সফল? যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

আমার দেশ

সুফিয়া কামাল

[লেখক-পরিচিতি : সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি অসামান্য ভূমিকা রাখেন। একটি প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন যুদ্ধ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয় এবং তাঁর কবিতা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি কিছুকাল কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল, ছন্দ সুললিত ও ব্যঞ্জনাময়। এই কর্মের স্বীকৃতির জন্য তাঁকে বাংলাদেশের জনগণ 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিষিক্ত করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য: *সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী,* এবং গল্পগ্রন্থ : *কেয়ার কাঁটা;* স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ : *একাত্তরের ডাইরী;* শিশুতোষ গ্রন্থ : *ইতল বিতল ও নওল কিশোরের দরবারে।* সাহিত্যকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, Women's Federation for World Peace Crest- সহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০শে নভেম্বর ১৯৯৯ সালে এই মহীয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।]

সূর্য-ঝলকে! মৌসুমী ফুল ফুটে
স্নিগ্ধ শরৎ আকাশের ছায়া লুটে
পড়ে মাঠভরা ধান্য শীর্ষ পরে
দেশের মাটিতে মানুষের ঘরে ঘরে।
আমার দেশের মাটিতে আমার প্রাণ
নিতি লভে নব জীবনের সন্ধান
এখানে প্লাবনে নুহের কিশ্‌তি ভাসে
শান্তি-কপোত বারতা লইয়া আসে।
জেগেছে নতুন চর –
সেই চরে ফের মানুষেরা সব পাশাপাশি বাঁধে ঘর।
নব অঙ্কুর জাগে–
প্রতি দিবসের সূর্য-আলোকে অন্তর অনুরাগে
আমার দেশের মাটিতে মেশানো আমার প্রাণের ঘ্রাণ
গৌরবময় জীবনের সম্মান।
প্রাণ-স্পন্দনে লক্ষ তরুর করে
জীবনপ্রবাহ সঞ্চারি মর্মরে
বক্ষে জাগায়ে আগামী দিনের আশা
আমার দেশের এ মাটি মধুর, মধুর আমার ভাষা।

নদীতে নদীতে মিলে হেথা গিয়ে ধায় সাগরের পানে
মানুষে মানুষে মিলে গিয়ে প্রাণে প্রাণে
সূর্য চন্দ্র করে
মৌসুমী ফুলে অঞ্জলি ভরে ভরে
আপন দেশের মাটিতে দাঁড়ায়ে হাসে
সূর্য-ঝলকে ! জীবনের ডাক আসে
সেই ডাকে দেয় সাড়া
নদী-প্রান্তর পার হয়ে আসে লক্ষ প্রাণের ধারা
মিলিতে সবার সনে
আমার দেশের মানুষেরা সবে মুক্ত-উদার মনে
আর্ত-ব্যথিত সুধী গুণীজন পাশে
সেবা–সাম্য–প্রীতি বিনিময় আশে
সূর্য-আলোকে আবার এদেশে হাসে
নিতি নবরূপে ভরে ওঠে মন জীবনের আশ্বাসে।

শব্দার্থ ও টীকা : সূর্য–ঝলকে–সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, উদ্ভাসিত। **মৌসুমী ফুল**–বিশেষ ঋতুতে (সময়ে) উৎপন্ন ফুল। **স্নিগ্ধ শরৎ**–শরৎকালের উজ্জ্বলতা। **ধান্য শীর্ষ**–ধানের ওপর ভাগ। **নূহের কিশ্‌তি**–সেমিটিক পুরাণ অনুসারে পৃথিবীতে মহাপ্লাবনের সময়ে একজন নবির যে বড় নৌকা সবাইকে রক্ষা করেছিল। **শান্তি – কপোত**– শান্তির কবুতর, কবুতরকে শান্তির প্রতীক বলা হয়। **বারতা**– সংবাদ, বার্তা।

পাঠ - পরিচিতি : সুফিয়া কামালের *উদাত্ত পৃথিবী* কাব্যের 'আমার দেশ' কবিতাটি 'সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ' থেকে সংকলন করা হয়েছে। বাঙালির সোনার বাংলা অসম্ভবকে সম্ভব করে, মাটি থেকে জন্ম দেয় সোনালি ফসল। চমৎকার এর জলবায়ু– সহনীয় রৌদ্রতাপ, নমনীয় জল-বৃষ্টি। তাই এর মাঠ ভরে ওঠে সোনালি ধানে, সবুজ পাটে, নানা বর্ণের ফলমূলে। এদেশের মানুষ পাশাপাশি ঘর বেঁধে তাই শান্তিতে বাস করে । দুর্যোগও যে আসে না তা নয়। কিন্তু দুর্যোগের সময় ও তা অতিক্রান্ত হওয়ামাত্র তারা আবার ঘর বাঁধে পাশাপাশি, থাকে শান্তিতে। বাংলার মানুষের মধুর ভাষা, অপার জীবনানন্দ তাদের নিয়ে যায় সম্প্রীতির মহাসাগরে। আকাশে যেমন সূর্য ওঠে, তেমনি ডাক আসে মিলনের। এদেশের মানুষ পরস্পরে মহামিলনের মধ্যেই প্রত্যহ নতুন হয়ে ওঠে। কবিতায় চিরায়ত বাংলার জীবনবাণী অসাধারণভাবে ধরা পড়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্প্রীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কে বার্তা নিয়ে আসে?

ক. স্নিগ্ধ শরৎ খ. শান্তি কপোত

গ. নূহের কিশ্‌তি ঘ. নতুন চর

২। 'আমার দেশ' কোন জাতীয় কবিতা?

ক. স্বদেশ প্রেমমূলক খ. জাগরণমূলক

গ. ঐতিহ্য বিষয়ক ঘ. প্রকৃতি বিষয়ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবল বন্যায় ভেসে যায় কুলিয়ারচর। ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলিম সবাই আশ্রয়কেন্দ্রে ওঠে। সবটুকু আনন্দ-বেদনাকে তারা ভাগাভাগি করে নেয়। এ যেন নতুন এক জীবন।

৩। উদ্দীপকে 'আমার দেশ' কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক. নতুন বসতি খ. শুভ সংবাদ

গ. সম্প্রীতি ঘ. প্রাণস্পন্দন

৪। উদ্দীপকে পরিবেশের যে রূপ ফুটে উঠেছে তা নিচের যে পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায় তা হলো–

i. শান্তি-কপোত বারতা লইয়া আসে
ii. সেই চরে ফের মানুষেরা সব পাশাপাশি বাঁধে ঘর
iii. নিতি নবরূপে ভরে ওঠে মন জীবনের আশ্বাসে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল–
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল –
ঝিঙে ফুল ॥

ক. 'কিশ্‌তি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'শান্তি-কপোত বারতা লইয়া আসে' – এ কথা দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপক ও 'আমার দেশ' কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধর।

ঘ. "বিষয়বস্তুর বর্ণনায় উদ্দীপক ও 'আমার দেশ' কবিতার সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্ট "– যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর।

আশা

সিকান্‌দার আবু জাফর

[কবি-পরিচিতি : খুলনা জেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৯১৯ সালের ১৯শে মার্চ সিকান্‌দার আবু জাফর জন্মগ্রহণ করেন। সিকান্‌দার আবু জাফর কর্মজীবনে ছিলেন সাংবাদিক। রেডিও পাকিস্তানে চাকরি থেকে শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক মিল্লাত, মাসিক সমকাল প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে' গানটি স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর গণসঙ্গীত ও কবিতা মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রেরণায় সমৃদ্ধ। সিকান্‌দার আবু জাফরের উল্লেখযোগ্য কাব্য : *প্রসন্ন শহর*, *বৈরী বৃষ্টিতে*, *তিমিরান্তিক*, *বৃশ্চিক লগ্ন*, *মালব কৌশিক* ইত্যাদি। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত হন। ৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে সিকান্‌দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।]

আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই,
যেথায় গভীর–নিশুত রাতে
        জীর্ণ বেড়ার ঘরে
নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই ॥
যেথায় লোকে সোনা–রূপায়
        পাহাড় জমায় না,
বিত্ত–সুখের দুর্ভাবনায়
        আয়ু কমায় না;
যেথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে
        তুষ্ট থাকে ভাই ॥
সারা দিনের পরিশ্রমেও
        পায় না যারা খুঁজে
একটি দিনের আহার্য–সঞ্চয়,
তবু যাদের মনের কোণে
        নেই দুরাশা গ্লানি,
নেই দীনতা, নেই কোনো সংশয়।
যেথায় মানুষ মানুষেরে
        বাসতে পারে ভালো
প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে
        জ্বালতে পারে আলো,

সেই জগতের কান্না-হাসির
অন্তরালে ভাই
আমি হারিয়ে যেতে চাই ॥

শব্দার্থ ও টীকা : আমি সেই জগতে ... ঘুমিয়ে থাকে ভাই – কে কীভাবে সুখী হবে তা নির্ধারিত নয়। মানুষ গতানুগতিক যেভাবে সুখী হয় কবি সেভাবে সুখী হওয়ার কথা এখানে বলেননি। সুখের চিন্তায় মানুষের রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু সুখী মানুষের ঘুমের সমস্যা হয় না। সারাদিন কাজের পর বিছানায় গেলেই শান্তির ঘুম তাকে তৃপ্তি দেয়। কবিও তেমনি সে রকম এক জীবন-যাপনের মাঝে যেতে চান যেখানে ভাঙা বেড়ার ঘরেও মানুষ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে; ঘুমিয়ে যেতে পারে। **বিত্ত-সুখের ... কমায় না** – সমাজের বেশির ভাগ মানুষ টাকা-পয়সা ও সম্পদের লোভে দিনাতিপাত করে; এতে সুখ হারাম হয়ে যায়; জীবন হয় যন্ত্রণাময়। এতে তাদের জীবন দীর্ঘ না হয়ে বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ে তারা আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনা মানুষকে সুখ তো দেয়ই না বরং তাদের আয়ু আরও কমে যায়। **যেথায় মানুষ ... জ্বালতে পারে আলো** – জীবনের সার্থকতা কোথায় এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের উপকার ও মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। মানবপ্রেম বা মানুষকে ভালোবাসতে পারার মাঝে জীবনের মহত্ত্ব নিহিত থাকে। প্রতিবেশীর দুঃখে এগিয়ে আসা, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার মাঝেও এক ধরনের তৃপ্তি আছে। কবি তাই বলেছেন যে, যেখানে মানুষকে ভালোবাসা যায়, প্রতিবেশীর দুঃখ-কষ্ট দূর করে আলো জ্বালানো যায়– সেখানেই তিনি থাকতে চান।

পাঠ-পরিচিতি : সিকান্দার আবু জাফরের *মালব কৌশিক* কাব্য থেকে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। জাগতিক এই পৃথিবী ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বাড়ছে ব্যবধান। কারও মনেই যেন শান্তি নেই। বিত্ত-বৈভব অর্জন করা আর সুখের দুর্ভাবনায় তাদের আয়ু কমে যাচ্ছে। কিন্তু কবি এসব অতিক্রম করে যেতে চাইছেন সেইসব মানুষের কাছে যারা প্রকৃত অর্থেই মানুষ। মনুষ্যত্বের আলো যারা জ্বালিয়ে রেখেছেন। দরিদ্র হলেও এই মানুষ বিত্তের পেছনে ছোটে না। সোনা-রুপার পাহাড় গড়ে তোলে না। জীর্ণ ঘরে বসবাস করেও তারা সুখী। তুচ্ছ, ছোটো ছোটো আনন্দ অবগাহনেই কাটে তাদের দিন। সারাদিন তারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, তাতে হয়তো একটি দিনের আহার্যও জোটে না। তবু কোনো দুরাশা বা গ্লানি তাদের গ্রাস করে না। কোনো দীনতা বা সংশয়ে তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয়। বরং দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে। প্রতিবেশীকে সাহায্য করে। কবি মনুষ্যত্বের অধিকারী এসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চাইছেন, হারিয়ে যেতে চাইছেন তাদের মাঝে। তিনি মনে করেন, এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ। কবিতাটিতে গণমানুষের প্রতি একাত্মতা, মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের সুগভীর সংবেদনা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। তোমার জানা গরিব কিন্তু সৎ কোনো ব্যক্তির জীবন পরিচিতি লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায় কোনটি কমে?

ক. সময় খ. অর্থ
গ. আয়ু ঘ. ভালোবাসা

২। 'প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে/জ্বালতে পারে আলো' – এখানে আলো বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পারস্পরিক সম্প্রীতি খ. বিপদে সাহায্য করা
গ. একে অন্যের খোঁজ নেওয়া ঘ. কাউকে তুচ্ছ না ভাবা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

একদা অত্যাচারী এক মোড়ল অসুস্থ হলে তার রোগমুক্তির জন্য কবিরাজ পরামর্শ দেয় সুখী মানুষের জামা পরার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেলেও দেখা যায়, তার কোনো জামা নেই।

৩। উদ্দীপকের সুখী মানুষটির সঙ্গে 'আশা' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে –

ক. ধনীদের খ. দরিদ্রদের
গ. আত্মতৃপ্তদের ঘ. দুর্ভাবনাগ্রস্তদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাদার তেরেসা আশৈশব স্বপ্ন দেখেন মানব সেবার। এক সময় যোগ দেন খ্রিষ্টান মিশনারি সংঘে। মানুষকে আরো কাছে থেকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আরও অনেকেই এগিয়ে আসেন এ মহান কাজে। এক সময় এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। সারা জীবনের তাঁর সবটুকু উপার্জনই বিলিয়ে দেন মানবের কল্যাণে।

ক. কোথায় মানুষেরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে?
খ. বিত্ত-সুখের ভাবনাহীন মানুষেরা সংশয়হীন কেন?
গ. মাদার তেরেসার মানসিকতা 'আশা' কবিতার যে দিকটিকে তুলে ধরে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "মাদার তেরেসার দর্শনই যেন 'আশা' কবিতার ভাববস্তু "– যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

[**কবি-পরিচিতি :** ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ই জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফররুখ আহমদ কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স ও ইংরেজিতে অনার্সের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে তিনি নানা পদে নিয়োজিত হন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বেতারে স্টাফ রাইটার পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য তাঁকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম্ মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, পাখির বাসা, হাতেমতায়ী, নতুন লেখা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর* ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, একুশে পদকসহ (মরণোত্তর) অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।]

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! – পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পূবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।
দিকদিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
বর্ষণ-মুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥

শব্দার্থ ও টীকা : বিদ্যুৎ রূপসী পরী – বিদ্যুৎ চমকানোকে লোকজ ধারণা অনুযায়ী সুন্দরী পরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায়। **সওয়ার** – আরোহী। **রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারির ... তৃষ্ণাতপ্ত মন** – দীর্ঘ বর্ষণহীন দিনে মাঠঘাট শুকিয়ে যে রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছে কবি তাকে রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখন বর্ষণের শুরুতে তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট ও বনে দেখা দিয়েছে প্রাণের জোয়ার। **তৃষাতপ্ত** – পিপাসায় কাতর। **বিষণ্ন মেদুর** – বৃষ্টিবিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা বৃষ্টির আগমনে দূরীভূত হয়েছে। প্রকৃতি এখন স্নিগ্ধকোমল হয়ে চারিদিক করে তুলেছে প্রাণোচ্ছল।

পাঠ-পরিচিতি: 'বৃষ্টি' কবিতাটি ফররুখ আহমদের *মুহূর্তের কবিতা* কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। কৃষিপ্রধান বাংলার বহুপ্রতীক্ষিত বৃষ্টি নিয়ে কবিতাটি লিখিত। প্রকৃতিতে বর্ষা আসে প্রাণস্পন্দন নিয়ে। আর বৃষ্টিই বর্ষার প্রাণ। এ সময় নদীর দু-ধারে প্লাবন দেখা দেয়, ফলে পলিমাটির গৌরবে ফসল ভালো হয়। বৃষ্টির সময় আকাশের সর্বত্র মেঘের খেলা দেখা যায়, বর্ষার ফুল চারদিকে মোহিত করে, রুক্ষ মাটি বৃষ্টিতে প্রাণ জুড়ায়। বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষও রসসিক্ত হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি, আর সে ভালোলাগার আলপনা আঁকে মনে মনে। এ বৃষ্টি কখনো বিষণ্ণও করে মন, একাকী জীবনে বাড়ায় বিরহ। সুতরাং বৃষ্টি শুধু প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক পালাবদলের নিয়ামক নয়, এর সঙ্গে ব্যক্তির জীবনও কতটা সম্পৃক্ত তারই কাব্যরূপ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। বর্ষার ঋতুতে প্রকৃতি যে নব সাজে সজ্জিত হয়, তার বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি বিদ্যুৎকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. কন্যার খ. পরি

গ. আলোর ঘ. বৃষ্টির

২। 'রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ আসমান' – এ চিত্রকল্পে কী ফুটে উঠেছে?

ক. বুভুক্ষ মাঠের চিত্র খ. বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি

গ. বৃষ্টিহীন মাঠের রূপ ঘ. প্রকৃতির বৈরিতা

৩। 'আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের আড়ে' – এ বক্তব্যের বিপরীত ভাব রয়েছে যে বাক্যে–

ক. বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়

খ. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়

গ. দু-পাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়

ঘ. নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার

সৃজনশীল প্রশ্ন

কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতায় মায়াবী আখর টানি।
আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে
বেণু-বনে বায়ু নীড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

ক. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোন কোন নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে?

খ. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায় কেন?

গ. উদ্দীপকের শেষ পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে বৃষ্টি কবিতার মিল কতটুকু তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ করে মাত্র,সমগ্র ভাব নয়"– তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

[**কবি-পরিচিতি :** আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আইএ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। তাঁর কবিতার স্নিগ্ধতা পাঠকচিত্তে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্তমানবতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য *রাত্রিশেষ*। এ ছাড়া *ছায়াহরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি,* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। ছোটোদের জন্য তাঁর কবিতার বই *জোছনা রাতের গল্প* ও *ছুটির দিন দুপুরে*। *রানী খালের সাঁকো* তাঁর কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। আহসান হাবীব তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি ও একুশে পদক পুরস্কার লাভ করেন। *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক থাকাকালে ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।]

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির – সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া

অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার –
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি

জমিলার মা'র
শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।

দু'পাশে ধানের খেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

শব্দার্থ ও টীকা : আসমান – আকাশ। **সাক্ষী** – কোনো কিছু নিজচোখে দেখেছেন এমন কেউ। **জমিন** – ভূমি। **নিশিরাইত** – 'নিশীথ রাত্রি'র গ্রামীণ কথ্যরূপ (গভীর রাত বোঝাতে)। **অভ্যাগত** – গৃহে এসেছে এমন ব্যক্তি, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত অতিথি। **ধানের মঞ্জরী** – মঞ্জরী হলো মুকুল বা শিষ, ধানের মঞ্জরী হলো ধানের শিষ বা মুকুল। **নিশিন্দা** – গ্রামীণ এক ধরনের গাছ। **জমিলার মা'র ... সব চিনি** – গরিব, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মা। তাদের রান্নাঘর শূন্যই থাকে সাধারণত। কারণ রান্না করার খাদ্য উপাদান তাদের নেই। যেহেতু রান্না করা হয় না, খাবারও খাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই থালা-বাসনও শুকনো থাকে। কবিও সেই অবস্থার কথা জানেন। **স্নিগ্ধ মাটির সুবাস** – মাটির মিষ্টি গন্ধ। অর্থাৎ মায়াবী ও আকর্ষণীয় গ্রামবাংলা। **দু'পাশে ধানের ক্ষেত ... আমার অস্তিত্বে গাঁথা** – কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের মতো ক্ষেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে আছে। এরা সবাই কবির খুবই চেনা-জানা।

পাঠ-পরিচিতি : জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর সবকিছুই তার মনে হয় কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির মধ্যে শিকড় গেড়ে থেকেই মানুষ তাই সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। এই অনুভূতি তুলনাহীন। দেশ মানে তো শুধু চারপাশের প্রকৃতি নয়, একে আপন সত্তায় অনুভব করা। আর দেশকে অনুভব করলেই দেশের মানুষকেও আপন মনে হবে আমাদের। এই কবিতায়

সেই অনুভবই আন্তরিক মমতায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কবি। তিনি উচ্চারণ করছেন, তিনি কোনো আগন্তুক নন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাকে চেনে। পাখি, কার্তিকের ধান কিংবা শুধু শিশির নয়, তিনি এই জনপদের মানুষকেও ভালোভাবে চেনেন। তিনি কদম আলী, জমিলার মা'র মতো মানুষের চিরচেনা স্বজন। কবি অনুভব করেন, যে-লাঙল জমিতে ফসল ফলায়, সেই লাঙল আর মাটির গন্ধ লেগে আছে তার হাতে, শরীরে। ধানক্ষেত আর ধু ধু নদীর কিনার, অর্থাৎ এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই তার জীবন বাঁধা। এই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব। এই হচ্ছে মানবজীবন, জন্মভূমির সঙ্গে যে-মানুষ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার সম্পর্কের পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আহসান হাবীব কার চিরচেনা স্বজন?

ক. পাখির　　খ. কদম আলীর
গ. জোনাকির　　ঘ. জমিলার মা'র

২। কবি বৈঠায় লাঙলে হাত রাখতে বলেছেন কেন?

ক. শপথ নেয়ার জন্য　　খ. পরশ অনুভব করার জন্য
গ. কবিকে খুঁজে পাবার জন্য　　ঘ. অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিপভ্যান উইংকেল দীর্ঘ বিশ বছর পর তার গাঁয়ে ফিরে এলে তাকে কেউ চিনতে পারেনি। সবাই তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে তার স্বজন টম এলে সব সন্দেহের অবসান ঘটে।

৩। উদ্দীপকের টমের সঙ্গে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে –

ক. কদম আলীর
খ. জমিলার মার
গ. অবোধ বালকের
ঘ. ভিনদেশি পথিকের

সৃজনশীল প্রশ্ন

> আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
> জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;
> হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
> হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
> হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
> রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
> ডিঙা বায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
> দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

ক. বিস্তর জোনাকি কোথায় দেখা যায়?

খ. 'আমি কোনো আগন্তুক নই' – কবি একথা বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা চিত্রের সাথে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার চেতনাগত বৈসাদৃশ্যই বেশি"– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

মে-দিনের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

[**কবি-পরিচিতি :** সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ভারতের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো : *পদাতিক*, *অগ্নিকোণ*, *চিরকুট*। তাঁর অনূদিত কাব্যগুলো হলো 'নাজিম হিকমতের কবিতা', '*পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ*',। চিন্তা-চেতনায় ও লেখনিতে তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে ধারণ করতেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলো হলো : আকাদেমি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার। তিনি ২০০৩ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।]

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা:
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না —
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগ পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য	-	পৃথিবীতে ধনীরা আরাম-আয়েশে থাকে। গরিবেরা, বঞ্চিতরা কষ্টে থাকে। কবি চান ধনী-গরিবের ভেদ দূর হোক। কিন্তু তার জন্য দরিদ্ররা-শোষিত বঞ্চিতরা সচেতন না হলে শোষণ থেকে তারা মুক্তি পাবে না। তার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে। তাই 'ফুল খেলা' অর্থাৎ অসচেতনভাবে চলতি আনন্দে গা-ভাসিয়ে দেয়াটা শোষিত-বঞ্চিতের জন্য উচিত হবে না। অদ্য- অর্থাৎ বর্তমানটা ভীষণ কষ্টের। তাই কবি তাদের সচেতন হতে এবং সংগ্রাম করতে বলেছেন।
সেঁকে	-	ভেজে।
সাইরেন	-	বিপদ সংকেত।
শতাব্দী	-	শত অব্দ বা শত বৎসর।
লাঞ্ছিত	-	নিপীড়িত, অত্যাচারিত।
আর্ত	-	পীড়িত।
বার্তা	-	খবর।
যৌবন আত্মা	-	বলিষ্ঠ আত্মা; সাহস আছে এমন তরুণ।

পাঠ-পরিচিতি: 'মে দিনের কবিতা' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক* কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রোমান্টিকতার পথ পরিহার করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে কবিতায়। ফুল খেলা আর বিলাসী জীবন যাপনের দিন আর নেই। এখন সকলকে এগিয়ে আসতে হবে সংগ্রামের পথে। সে-পথ কঠিন, সে-পথ দুর্গম, বড় বেশি কঠোর। তবু কবি সে-পথেই আহ্বান জানিয়েছেন তার প্রিয় মানুষকে। শোষক-নির্যাতক-অত্যাচারীর হাত থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-নির্মম শোষণ চলেছে, আজ তা প্রতিহত করার দিন এসেছে। তাই কবি মুক্তির পথে, সংগ্রামের পথে, সকলকে একাত্ম হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। মে দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ধ্বংসের মুখোমুখি' বলতে বোঝানো হয়েছে —

i. নিঃশেষ হওয়া
ii. মৃত্যুবৎ বেঁচে থাকার অবস্থা
iii. মৃত্যুকে জয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা ।

২. 'ভীরু' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে

i. ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা
i. ভয় পাওয়া অবস্থা
iii. কাপুরুষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

৩. 'পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে—

ক. নিজেদের টিকে থাকার সংগ্রাম খ. অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান হওয়া
গ. যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ঘ. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া

৪. জাতি আজ কীসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে?

ক. কাঠফাটা রোদের খ. চিমনির মুখে
গ. যুদ্ধের সজ্জার ঘ. ধ্বংসলীলার

৫. প্রতি নিঃশ্বাসে লজ্জা আনে–

i. দীর্ঘ দিনের লাঞ্ছিত আর্তের কান্না

ii. মৃত্যুর ভয়ে চুপ-চাপ বসে থাকা

iii. যুদ্ধের সজ্জা খুঁজে না পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হে মহাজীবন আর এ কাব্য নয়

এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো

পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক

গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো

ক. 'কাস্তে' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,'—দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে 'মে-দিনের কবিতার' কোথায় মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো'— উক্তিটি 'মে-দিনের কবিতা'র আলোকে ব্যাখ্যা কর।

পোস্টার

আবুল হোসেন

কবি-পরিচিতি : আবুল হোসেন ১৫ই আগস্ট ১৯২২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি খুলনা জেলার দেয়ারা গ্রামে। আবুল হোসেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি বিষয়ে বি.এ. সম্মান ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কবিতায় দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। চিত্রময়তা ও শব্দের প্রয়োগকুশলতা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হচ্ছে : *নববসন্ত*, *বিরস সংলাপ*, *হাওয়া তোমার কী দুঃসাহস* ইত্যাদি। *ইকবালের কবিতা*, *বিভিন্ন ভাষার কবিতা*, *অন্য ক্ষেতের ফসল* ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ কাব্য। আবুল হোসেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, পদাবলী পুরস্কারসহ প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ২০১৪ সালের ২৯ জুন তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

জেনেছি সত্য বহু দিন মনে মনে
মুক্তির পথ মিশে গেছে জনগণে,
যেখানে লক্ষ লোকের রুক্ষ হাত
সৃষ্টির মাঝে নিয়োজিত দিনরাত,
যেখানে মানুষ দৈনন্দিন কাজে
প্রাণপাত করে দুঃস্বপ্নের মাঝে,
মাটিতে শিকড় গেড়ে যারা বেঁচে আছে,
আধমরা হয়ে পাষাণের রসে বাঁচে,
সেই জনতার দীপ্ত মিছিল ধরে
নবযুগ আসে রক্ত দিনের ভোরে।

শব্দার্থ ও টীকা : জেনেছি সত্য .... গেছে জনগণে – 'জেনেছি সত্য' হলো এক ধরনের বিশ্বাস যা বহুদিন ধরে মনের মাঝে কবি বহন করে চলেছেন। আর সে বিশ্বাসটি হলো মানুষের মুক্তির পথ জনগণের মাঝেই মিশে আছে। 'জনগণ' বলতে সাধারণ খেটে-খাওয়া, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে বোঝানো হয়েছে। সেই জনগণের ভেতর থেকেই মুক্তির সোপান বেরিয়ে আসবে।

আধমরা হয়ে পাষাণের রসে বাঁচে – সমাজের খেটে-খাওয়া মানুষ, যাদের কর্মযজ্ঞেই এই পৃথিবী এত সুন্দর সেই মানুষেরা সমাজে দু'বেলা খেতে পায় না, তাদের জীবনে কোনো রস নেই, বৈচিত্র্য নেই, যেন পাষাণের মতো বা পাথরের মতো নীরস তাদের জীবন।

সেই জনতার দীপ্ত ... রক্ত দিনের ভোরে – খেটে খাওয়া মানুষ, জনতা নিজেদের ভাগ্যকে নিজেদের হাতে বদলানোর জন্য একদিন সোচ্চার হয়ে ওঠে, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, রাজপথে নেমে আসে, মিছিল করে– এভাবে এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি যখন করে তখনই নতুন যুগের সৃষ্টি হয়; সকল অত্যাচার নির্যাতন দূর হয়।

পাঠ-পরিচিতি : এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের পরিশ্রমের কারণে। যেখানে লক্ষ হাত একত্রিত হয় সেখানেই শক্তি দৃঢ়তর হয়; সেখানেই সৃষ্টির নতুন পথ হয় রচিত। যে মানুষ দুঃস্বপ্নের মধ্যেও দিনরাত কাজ করে, যারা শত বাধাকে উপেক্ষা করে মা ও মাটির টানে দেশের হিতার্থে নিয়োজিত, যারা অর্ধাহার-অনাহারেও দেশত্যাগ করে অন্যত্র চিরদিনের মতো চলে যায় না তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমী। সেই শ্রমজীবী, মেহনতি সাধারণ মানুষের কাতারে মিশে গেলেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ পাওয়া সম্ভব। কবি মনে করেন, এটাই মুক্তির মৌল সত্য। কবিতাটিতে মানবমুক্তি ও প্রগতির চিরন্তন সে সত্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। সভ্যতা বিকাশে খেটে খাওয়া মানুষের অবদানের ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মুক্তির পথ কোথায় মিলে গেছে?

ক. পথে খ. মিছিলে
গ. জনগণে ঘ. সম্মেলনে

২। মানুষ কেন দুঃস্বপ্নের মাঝে থাকে?

ক. সমস্যার জন্য খ. সৃজনের জন্য
গ. উপেক্ষার জন্য ঘ. দৈনন্দিন কাজের জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল–
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের কারো বিচঞ্চল
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক, সত্যের প্রসাদ
গিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ।

৩। উদ্দীপকে 'পোস্টার' কবিতায় কোন দিক উন্মোচিত হয়েছে?

ক. বঞ্চনা খ. অধিকারহীনতা
গ. নতুন দিনের সম্ভাবনা ঘ. স্বপ্নময়তা

৪। উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে 'পোস্টার' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি?

ক. মুক্তির পথ মিশে গেছে জনগণে,
খ. দৈনন্দিন কাজে, প্রাণপাত করে দুঃস্বপ্নের মাঝে,
গ. নবযুগ আসে রক্ত দিনের ভোরে
ঘ. আধমরা হয়ে পাষাণের রসে বাঁচে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

ক. কারা দিনরাত সৃষ্টির মাঝে নিয়োজিত?
খ. কারা আধমরা হয়ে বেঁচে আছে? বুঝিয়ে লিখ।
গ. উদ্দীপকে 'পোস্টার' কবিতার কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপক 'পোস্টার' কবিতার মূলভাব পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেনি।" – মূল্যায়ন কর।

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[**কবি-পরিচিতি :** সুকান্ত ভট্টাচার্য ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা কিশোর সুকান্তকে দারুণভাবে স্পর্শ করে। এছাড়া সামাজিক নানা অনাচার ও বৈষম্য তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তাঁর কবিতায় এই অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধ্বনিত প্রবল প্রতিবাদ আমাদের সচকিত করে। নিপীড়িত গণমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কাব্য: *ছাড়পত্র*, *ঘুম নেই*, *পূর্বাভাস*, *অভিযান*, *হরতাল* ইত্যাদি। ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে কবি মৃত্যুবরণ করেন।]

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার –
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ – বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিটমিট করে চায়;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়!
কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে –
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ রানার! এখনো রাতের কালো।
এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।

অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?

রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে–
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,–
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি–
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা বয়ে?
কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে – আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
    ভীরুতা পিছনে ফেলে –
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর,
    অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি–
    নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
    দুর্দম, হে রানার ॥

শব্দার্থ ও টীকা : রানার– ইংরেজি শব্দ 'runner'-এর আভিধানিক অর্থ যিনি দৌড়ান। এখানে 'ডাক হরকরা' অর্থে ব্যবহৃত। **নতুন খবর আনার–** ডাক হরকরার ব্যাগে মানুষের সুখ-দুঃখের অনেক অজানা সংবাদ থাকে। চিঠি বিলি হলে সে সংবাদ মানুষ জানতে পারে। তাই ডাক হরকরাকে নতুন খবরের

বাহক বলা হয়েছে। **দুর্বার–** যাকে নিবারণ করা যায় না। **হরিণের মতো যায়–** এটি একটি উপমা। হরিণ যেমন নিঃশব্দে কিন্তু অতি দ্রুত দৌড়ায়, রানারও তেমনি। **লণ্ঠন–** হারিকেন বা তেল দিয়ে চালিত আলোর আধার। **ভোর তো হয়েছে– আকাশ হয়েছে লাল–** এটি প্রতীক। বাচ্যার্থে রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে আকাশে সূর্য উঠছে। কিন্তু প্রতীকী অর্থে কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে সুখের সোনালি আলো দেখা দিচ্ছে।

পাঠ-পরিচিতি : সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি কবির *ছাড়পত্র* কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটি শ্রমজীবী মানুষ রানারদের নিয়ে লেখা। তাদের কাজ হচ্ছে গ্রাহকদের কাছে ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনের চিঠি পৌঁছে দেওয়া। রানাররা এতটাই দায়িত্বশীল যে কোনো কিছুই তাদের কাজের বাধা হয়ে ওঠে না। রাত হোক, দুর্গম পথ হোক, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক – নিরন্তর তাদের এই কাজ করে যেতে হয়। চিঠি মানেই সুখে-আনন্দে, দুঃখে-শোকে ভরা সংবাদ। এই সংবাদের জন্যেই অপেক্ষায় থাকে প্রিয়জনরা। প্রিয়জনদের কাছে যথাসময়ে এই খবর পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। রানারদের তাই ক্লান্তি নেই, অবসর নেওয়ার অবকাশ নেই। তারা ছুটছেন তো ছুটছেনই। এই মহান পেশায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তারা যে মানুষ হিসেবে কতটা মহৎ, কবিতাটিতে এই ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। 'শ্রমজীবী মানুষ যেসব পণ্য উৎপাদন করে তারা সে পণ্য ব্যবহার করতে পারে না'– শিরোনামে একটি রচনা লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রানারের কাছে পৃথিবীটা 'কালো ধোঁয়া' মনে হয় কেন?

ক. মেঘাচ্ছন্ন থাকায় খ. অভাবের তাড়নায়
গ. সূর্য না ওঠায় ঘ. কলকারখানার কারণে

২। দস্যুর ভয়ের চেয়েও রানার সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন?

ক. চাকরি হারানোর জন্য খ. ডাক না পাওয়ার ভয়ে
গ. বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায় ঘ. দায়িত্ববোধের কারণে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন বেশ স্বেচ্ছাচারী। সব কাজই দায়সারা গোছে শেষ করে। ইচ্ছামতো অফিসে যাতায়াত করে। একদিন জরুরি সভা উপলক্ষে কর্মকর্তা অফিসে এসে দেখেন গেট বন্ধ। ফলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়।

৩। উদ্দীপকের সুমন ও 'রানার' কবিতার রানার-এর সাদৃশ্যের দিকটি হলো তারা উভয়েই –

i. চাকরিজীবী

ii. দায়িত্ব সচেতন

iii. সেবাদানকারী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সামাদ সাহেব ব্যাংকে ক্যাশিয়ার হিসেবে ৩০ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। সবার আগে অফিসে আসেন এবং সবশেষে অফিস ত্যাগ করেন। একদিন ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অপরাহ্ণে তিনি বাড়ি যান। পরদিন যথাসময়ে তিনি ফিরে আসেন। তার কারণে কারো এতটুকু কষ্ট যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন।

ক. রানার ভোরে কোথায় পৌঁছে যাবে?

খ. 'রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে ' রানার কেন ছোটে?

গ. উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের মাঝে 'রানার' কবিতার রানার চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সামাদ সাহেব 'রানার' চরিত্রের বিশেষ দিককে ধারণ করলেও রানার স্বতন্ত্র"– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

[**কবি-পরিচিতি :** শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তিনি ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। তিনি একনিষ্ঠভাবে কাব্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। তাঁর প্রধান কাব্য : *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, বন্দী শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়,* ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর কিছু অনুবাদ-কবিতা ও শিশুতোষ কবিতা রয়েছে। শামসুর রাহমান তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-কীর্তির জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। তিনি ১৭ই আগস্ট, ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে

আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুড়ে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন – তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্ণের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে,
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজি তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে –
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা। (সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা : খাণ্ডবদাহন – খাণ্ডব মূলত মহাভারতের একটি বিখ্যাত অরণ্য, যা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছিল অরণ্যের প্রায় সকল প্রাণীকে। এ কবিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞকে খাণ্ডবদাহন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। **সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর** – মুক্তিযুদ্ধের শহিদ হয়েছেন হরিদাসীর স্বামী। এ কারণে বিধবা হরিদাসীর সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়েছে। সনাতন ধর্মের বিবাহকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে সধবারা সিঁদুর পরেন, স্বামীর মৃত্যু হলে সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়। হরিদাসীকেও হতে হয়েছে সিঁদুরবিহীন। **যত্রতত্র** – যেখানে সেখানে, সব জায়গায়; **তুমি আসবে বলে...ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো** – নয় মাসব্যাপী সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদান বাহিনি নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। ধ্বংস করেছে ছাত্রাবাস, বস্তি। কারণ ছাত্রজনতার প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ছাত্রাবাস ও বস্তি। হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা চেয়েছিল প্রতিরোধের সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে। তাই তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল গ্রাম ও শহর। নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের

মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল বাঙালি জাতিকে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অপরিসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে। **থুত্থুড়ে এক বুড়ো** – বয়সের ভারে বিধ্বস্ত লোক, যার বয়স অনেক হয়েছে এবং চলাচল করতে যার কষ্ট হয়; **রুস্তম শেখ ... এখন পোকার দখলে** – রুস্তম শেখ নামের এক রিক্‌শাওয়ালা যিনি যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। মৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে 'যার ফুসফুস এখন পোকার দখলে'।

পাঠ-পরিচিতি: 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতাটি *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* নামক কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি কবির *বন্দী শিবির থেকে* নামক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা শুধু শব্দমাত্র নয়, এটি এমন এক অধিকার ও অনুভব যা মানুষের জন্মগত। কিন্তু এই অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি জাতিকে দীর্ঘ কাল যেমন সংগ্রাম করতে হয়েছে তেমনি করতে হয়েছে অপরিসীম আত্মত্যাগ। ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে আপামর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধচলাকালে বাঙালির রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় পাকিস্তানি যুদ্ধবাজরা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে সকিনা বিবির মতো গ্রামীণ নারীর সহায়-সম্বল-সম্ভ্রম বিসর্জিত হয়েছে, হরিদাসী হয়েছে স্বামীহারা, নবজাতক হারিয়েছে মা-বাবাকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ছাত্রাবাস আক্রমণ করে ছাত্রদের হত্যা করে, শহরের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গণহত্যা চালায়, পুড়িয়ে দেয় গ্রাম ও শহরের লোকালয়। এর প্রাকৃতিক প্রতিবাদ ওঠে পশুর কণ্ঠেও। আর্তনাদ করে কুকুরও। মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, জেলে, রিক্‌শাওয়ালা প্রমুখ সাধারণ মানুষ আত্মত্যাগ করে। দগ্ধ হওয়া লোকালয় প্রবীণ বাঙালির আলোকিত চোখে অগ্নি ঝরায়। সেইসঙ্গে নবীন রক্তে প্রাণস্পন্দন ও আশা জেগে থাকতে দেখে কবি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন– এত আত্মত্যাগ যার উদ্দেশ্যে সেই স্বাধীনতাকে বাঙালি একদিন ছিনিয়ে আনবেই। কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য সাহিত্যিক দলিল।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। কবিতাটিতে স্বাধীনতার জন্য যেসব শ্রেণি-পেশা ও সাধারণ মানুষের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দানবের মতো চিৎকার করতে করতে কী এসেছিল?

ক. পাকিস্তানিসেনা খ. ট্যাঙ্ক
গ. মাঝি ঘ. রাইফেল

২। 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো – 'ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো'– এ পঙ্ক্তিতে কিসের চিত্র আছে?

ক. স্বাধীনতার সুর খ. ধ্বংসের চিত্র
গ. গণ-আন্দোলনের রূপ ঘ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

চিনতে নাকি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে
মুকত বাতাস কিনতে।

৩। উদ্দীপকের ক্ষুদিরাম 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কাদের প্রতিনিধিত্ব করে –

i. মুক্তিযোদ্ধাদের

ii. আপামর জনসাধারণের

iii. আত্মত্যাগী মানুষদের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪। এরূপ প্রতিনিধিত্বের কারণ কী?

ক. ঐক্যচেতনা   খ. স্বজাত্যবোধ

গ. দেশপ্রেম   ঘ. সাহসিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই শাসকগোষ্ঠী শুরু করে নানা বৈষম্যনীতি। তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হীন ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু এদেশের ছাত্র-শিক্ষকসহ আপামর জনতা এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, বিসর্জন দেয় বুকের তাজা রক্ত।

ক. কার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল?

খ. জলপাই রঙের ট্যাঙ্ককে কবি দানব বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের যে ভাবটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বর্ণিত দিকগুলোর একটিমাত্র দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে "– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

অবাক সূর্যোদয়

হাসান হাফিজুর রহমান

[**কবি - পরিচিতি :** হাসান হাফিজুর রহমান ১৪ই জুন ১৯৩২ সালে জামালপুর জেলার কুলকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হাসান হাফিজুর রহমান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. এবং বাংলায় এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন ভাষা- আন্দোলনের একজন অসাধারণ সংগঠক। ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* গ্রন্থটি বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করে। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতাসহ অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন অকুতোভয় এক সৈনিক। স্বাধীনতা-উত্তর কালে তিনি সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এর তিনি ছিলেন প্রধান। তাঁর সম্পাদনায় ষোলো খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র' প্রকাশিত হয়। তিনি কবি, সমালোচক ও গল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য : *বিমুখ প্রান্তর, আর্ত-শব্দাবলি, অন্তিম শরের মতো*, ইত্যাদি। প্রবন্ধগ্রন্থ : *আধুনিক কবি ও কবিতা, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, গল্পগ্রন্থ : *আরো দুটি মৃত্যু* ইত্যাদি। হাসান হাফিজুর রহমান লেখক সংঘ পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তভীষণ মুখমণ্ডলে চমকায় বরাভয়।
বুকের অধীর ফিনকির ক্ষুরধার
শহিদের খুন লেগে
কিশোর তোমার দুই হাতে দুই
সূর্য উঠেছে জেগে।
মানুষের হাতে অবাক সূর্যোদয়,
যায় পুড়ে যায় মর্তের অমানিশা
শঙ্কার সংশয়।
কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখো
প্রবল অহংকারে সূর্যের সাথে
অভিন্ন দেখ অমিত অযুত লাখ।
সারা শহরের মুখ
তোমার হাতের দিকে
ভয়হারা কোটি অপলক চোখ একাকার হলো
সূর্যের অনিমিখে।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখো
লোলিত পাপের আমূল রসনা ক্রূর অগ্নিতে ঢাক।
রক্তের খরতানে

জাগাও পাবক প্রাণ
কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু
মনুষ্যত্বের ধিক অপমান
কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখো
কুহেলী পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে
লাখ অযুতকে ডাক।
কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তশোভিত মুখমণ্ডলে চমকায় বরাভয়।

শব্দার্থ ও টীকা : আকুল সূর্যোদয় – নতুন দিন আসার ব্যগ্র বাসনা। **বরাভয়** – আশীর্বাদ বা আশ্বাসসূচক করভঙ্গি বা হাতের মুদ্রাবিশেষ। **খুন** – রক্ত। **মর্ত্যের অমানিশা** – পৃথিবীর দুর্দিন বা পৃথিবীর অন্ধকার। **অমিত**– অপরাজেয়। **অযুত**– দশ হাজার, **অপলক** – পলকহীন। **অনিমিখে** – এক দৃষ্টিতে পলকহীনভাবে। **লোলিত**– কম্পিত, আন্দোলিত। **খরতানে** – কর্কশ সুরে। **পাবক**– আগুন। **আপামর** – সর্বসাধারণ। **কুহেলী** – কুয়াশা। **রক্তশোভিত** – রক্ত দ্বারা রঞ্জিত।

পাঠ-পরিচিতি : কিশোর বয়সটি হচ্ছে দুর্জয় সাহস আর সৃষ্টিশীলতার সময়। কবিতাটি এই কিশোর বন্দনারই গাথা। চমৎকার কিছু ছবি, ভাবনা আর প্রতীকের মধ্য দিয়ে কবি এখানে কিশোরদের জয়গান করেছেন। কবি মনে করেন, কিশোররাই হচ্ছে সেই ভয়হীন সত্তার অধিকারী, শহিদের খুন যাদের দুই হাতে সূর্যোদয় হয়ে জেগে ওঠে। এই সূর্যের আলোতেই কেটে যায় পৃথিবীর অন্ধকার। কিশোর তার দুই হাতকে সূর্যের মতোই অহংকারে উঁচু করে রাখুক, এটাই কবির কামনা। উত্তোলিত এই হাতই, কবি মনে করেন, মানুষকে বরাভয় হতে শেখাবে। ঢেকে যাবে সমস্ত পাপ। পুড়ে যাবে পশুত্ব। অযুত মানুষকে মিছিলে জানাবে আহ্বান। সূর্য আর উত্তোলিত হাতের প্রতীকে কৈশোরক সাহসিকতা আর বরাভয়কে এভাবেই বর্ণনা করেছেন কবি।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। কিশোর বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কার খুন লেগে সূর্য জেগে উঠেছে?

ক. কিশোরের খ. শহিদের
গ. বাঙালির ঘ. মানুষের

২। 'কুহেলি পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে
লাখ অযুতকে ডাক।'
'লাখ অযুতকে ডাক' বলতে বোঝানো হয়েছে –

ক. মুক্তিকামী জনতা খ. মেহনতি মানুষ
গ. মিছিলের সহযোদ্ধা ঘ. সাধারণ শ্রমিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী।

৩। উদ্দীপকে 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো –

i. পরাধীনতা থেকে মুক্তির আহ্বান
ii. মনুষ্যত্বের অপমানকারীদের ধ্বংস কামনা
iii. ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃপ্ত শপথের অঙ্গীকার।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪। উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভব নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. কিশোর তোমার দুই হাতে দুই
সূর্য উঠেছে জেগে

খ. কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু

গ. সারা শহরের মুখ
তোমার হাতের দিকে

ঘ. হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তশোভিত মুখমণ্ডলে চমকায় বরাভয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী ভীরু বঙ্গজ পুঙ্গব সব
এই মহাকাব্যের কাননে খোঁজে
নতুন বিস্ময়। কলমের সাথে আজ
কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে।
কবিতায় আর নতুন কী লিখব ?
যখন বুকের রক্তে
লিখেছি একটি নাম
বাংলাদেশ।

ক. 'বরাভয়' শব্দের অর্থ কী ?

খ. 'মনুষ্যত্বের ধিক অপমান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের প্রতিফলিত দিকের সঙ্গে 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতার সাদৃশ্য কীসে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবটি 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু নয়" – মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

বোশেখ

আল মাহমুদ

[**কবি-পরিচিতি :** আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তিনি দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতার পর তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর কবিতায় লোকজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ যেমন লক্ষণীয় তেমনি রয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি। তাঁর প্রকাশিত কাব্য : *লোক লোকান্তর*, *কালের কলস*, *সোনালি কাবিন* ইত্যাদি। কথাসাহিত্য : *পানকৌড়ির রক্ত*, *পাখির কাছে ফুলের কাছে* তাঁর শিশুতোষ কবিতার বই। কবি ২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।]

যে বাতাসে বুনোহাঁসের ঝাঁক ভেঙে যায়
জেটের পাখা দুমড়ে শেষে আছাড় মারে
নদীর পানি শূন্যে তুলে দেয় ছড়িয়ে
নুইয়ে দেয় টেলিগ্রাফের থামগুলোকে।

সেই পবনের কাছে আমার এই মিনতি
তিষ্ঠ হাওয়া, তিষ্ঠ মহাপ্রতাপশালী,
গরিব মাঝির পালের দড়ি ছিঁড়ে কী লাভ?
কী সুখ বলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষির ভিটে?

বেগুন পাতার বাসা ছিঁড়ে টুনটুনিদের
উল্টে ফেলে দুঃখী মায়ের ভাতের হাঁড়ি
হে দেবতা, বলো তোমার কী আনন্দ,
কী মজা পাও বাবুই পাখির ঘর উড়িয়ে?

রামায়ণে পড়েছি যার কীর্তিগাথা
সেই মহাবীর হনুমানের পিতা তুমি?
কালিদাসের মেঘদূতে যার কথা আছে
তুমিই নাকি সেই দয়ালু মেঘের সাথী?

তবে এমন নিঠুর কেন হলে বাতাস
উড়িয়ে নিলে গরিব চাষির ঘরের খুঁটি
কিন্তু যারা লোক ঠকিয়ে প্রাসাদ গড়ে
তাদের কোনো ইট খসাতে পারলে নাতো।

হায়রে কতো সুবিচারের গল্প শুনি,
তুমিই নাকি বাহন রাজা সোলেমানের
যার তলোয়ার অত্যাচারীর কাটতো মাথা
অহমিকার অট্টালিকা গুঁড়িয়ে দিতো।

কবিদের এক মহান রাজা রবীন্দ্রনাথ
তোমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন করজোড়ে
যা পুরানো শুষ্ক মরা, অদরকারি
কালবোশেখের একটি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে।

ধ্বংস যদি করবে তবে, শোনো তুফান
ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের
পরের শ্রমে গড়ছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহাদুরি গুঁড়িয়ে ফেলো।

শব্দার্থ ও টীকা : বুনোহাঁস– যে হাঁস গৃহপালিত নয়, বনে থাকে। **জেট–** দ্রুতগতিসম্পন্ন উড়োজাহাজ। **টেলিগ্রাফ–** সংকেতের সাহায্যে দূরে বক্তব্য প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। ১৮৩৭ সালে আধুনিক এই যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত হয়। (এখন এ ধরনের যন্ত্র আর ব্যবহার হয় না।)। **তিষ্ঠ–** স্থির হও। **রামায়ণ–** পৃথিবীর চারটি জাত মহাকাব্যের একটি। রচয়িতা– বাল্মীকি। **মহাবীর হনুমান–** রামায়ণে বীর হনুমানের বীরত্বপূর্ণ বহু কর্মের কথা উল্লেখ আছে। রামায়ণোক্ত হনুমানকে মহাবীর হনুমান বলা হয়। **কালিদাসের মেঘদূত–** সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন কালিদাস। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অমর রচনা মেঘদূতম্ কাব্য। মেঘদূতম্‌কে বাংলায় মেঘদূত বলা হয়। **রাজা সোলেমান–** ডেভিডের পুত্র এবং ইসরাইলের তৃতীয় রাজা। তিনি বীর ও দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। **অদরকারি–** যার প্রয়োজন নেই।

পাঠ-পরিচিতি : কবি আল মাহমুদের *কবিতা সমগ্রের পাখির কাছে ফুলের কাছে* কাব্য থেকে 'বোশেখ' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি পরাক্রমশালী মাস বৈশাখ। ঋতুপরিক্রমায় বার বার সে রুদ্র সংহারক রূপে আবির্ভূত হয়। বৈশাখের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে এবং আগ্রাসী থাবায় কখনও কখনও লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এক-একটা জনপদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর শিকার হয় দুঃখী দরিদ্র মানুষ বা অসহায় কোন প্রাণী। ছিঁড়ে যায় গরিব মাঝির পালের দড়ি, উড়ে যায় দরিদ্র চাষির ঘর। ছোট্ট টুনটুনির বাসাও রেহাই পায় না। কিন্তু ধনীর প্রাসাদের কোন ক্ষতি হয় না। কবি তাই আক্ষেপ করে বলছেন, প্রকৃতির যত নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা কেন শুধু এই গরিবের বিরুদ্ধেই ঘটবে? অবশেষে বৈশাখের কাছে তার আহ্বান, ধ্বংস যদি করতেই হয়, তাহলে গুঁড়িয়ে দাও সেইসব অট্টালিকা যা গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। এই কবিতায় বৈশাখের বিধ্বংসী প্রতীকের মধ্য দিয়ে অত্যাচারীর অবসান কামনা করেছেন কবি।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। কালবৈশাখী আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যে ক্ষতি করে তার তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বৈশাখের কীর্তিগাথা কোথায় আছে?

ক. মহাভারতে   খ. রামায়ণে

গ. সোনালি কাবিনে   ঘ. কালের কলসে

২। কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে সম্বোধন করা হয়েছে?

ক. কবিগুরু   খ. মহান কবি

গ. মহান রাজা   ঘ. বিশ্বকবি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিশ্বাস বায়ে   মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
যাক পুরাতন স্মৃতি,   যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥

৩। উদ্দীপকে 'বোশেখ' কবিতার কোন দিক উন্মোচিত হয়েছে?

ক. ধ্বংসাত্মক রূপ   খ. সৃজনশীল রূপ

গ. পরিশুদ্ধ রূপ   ঘ. প্রখর রূপ

৪। উদ্দীপকের অনুভূতি 'বোশেখ' কবিতার কোন পঙ্ক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. যে বাতাসে বুনোহাঁসের ঝাঁক ভেঙে যায়

খ. উড়িয়ে নিলে গরিব চাষির ঘরের খুঁটি

গ. তুমিই নাকি বাহন রাজা সোলেমানের

ঘ. শোনো তুফান ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

বন্যার্ত মানুষের জন্য ত্রাণের আয়োজন করা হয়। ত্রাণকমিটি খুবই কঠোরভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখে। হতদরিদ্র রাসুর পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি থাকায় দুইবার ত্রাণ নিতে এলে অনিয়মের দায়ে তার কার্ড বাতিল করা হয়। বরাদ্দের চেয়ে কম চাল দেয়ার প্রতিবাদ করলে রহম আলীকে বেদম প্রহার করে রিলিফ ক্যাম্প থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমন সময় যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শমসের আলী চৌধুরী এলে তাদের প্রত্যেককে এক মণ চাল, আধা মণ ডালসহ অন্য ত্রাণসামগ্রী নৌকায় পৌঁছে দিয়ে আসেন ত্রাণকমিটির প্রধান কর্তাব্যক্তি।

ক. 'তিষ্ঠ' কথার অর্থ কী?

খ. পবনের কাছে কবি মিনতি করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দরিদ্র শ্রেণির সাথে রিলিফ কমিটির আচরণের মাধ্যমে ফুটে ওঠা দিকটি 'বোশেখ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বোশেখ' কবিতার একটা খণ্ডচিত্র মাত্র, পূর্ণরূপ নয়" – যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া

রফিক আজাদ

[**কবি-পরিচিতি :** রফিক আজাদ ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ সালে টাঙ্গাইল জেলার জাহিদগঞ্জের গুণীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে টাঙ্গাইলের ব্রাহ্মণশাসন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা এবং নেত্রকোনা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সালে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা ও সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। প্রেম, দ্রোহ ও প্রকৃতিনির্ভর কবিতার এক তাৎপর্যপূর্ণ জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য: *অসম্ভবের পায়ে, চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া, সশস্ত্র সুন্দর* ইত্যাদি। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আলাওল পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ১২ই মার্চ ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

স্পর্শ কাতরতাময় এই নাম
উচ্চারণমাত্র যেন ভেঙে যাবে,
অন্তর্হিত হবে তার প্রকৃত মহিমা,
চুনিয়া একটি গ্রাম, ছোট্ট – কিন্তু ভেতরে-ভেতরে
খুব শক্তিশালী
মারণাস্ত্রময় সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।
মধ্যরাতে চুনিয়া নীরব।
চুনিয়া তো ভালোবাসে শান্তস্নিগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ,
চুনিয়া প্রকৃত বৌদ্ধ-স্বভাবের নিরিবিলি সবুজ প্রকৃতি;
চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি।
চুনিয়া কখনো কোনো হিংস্রতা দ্যাখেনি।
চুনিয়া গুলির শব্দে আঁতকে ওঠে কি?
প্রতিটি গাছের পাতা মনুষ্যপশুর হিংস্রতা দেখে না না করে ওঠে?
– চুনিয়া মানুষ ভালোবাসে।
বৃক্ষদের সাহচর্যে চুনিয়াবাসীরা প্রকৃত প্রস্তাবে খুব
সুখে আছে।
চুনিয়া এখনো আছে এই সভ্যসমাজের
কারো-কারো মনে,
কেউ-কেউ এখনো তো পোষে
বুকের নিভৃতে এক নিবিড় চুনিয়া।
চুনিয়া শুশ্রূষা জানে,
চুনিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধে, চুনিয়া সান্ত্বনা শুধু –
চুনিয়া কখনো জানি কারুকেই আঘাত করে না;
চুনিয়া সবুজ খুব, শান্তিপ্রিয় – শান্তি ভালোবাসে,
কাঠুরের প্রতি তাই স্পষ্টতই তীব্র ঘৃণা হানে।
চুনিয়া চিৎকার খুব অপছন্দ করে,

চুনিয়া গুলির শব্দ পছন্দ করে না।
রক্তপাত, সিংহাসন প্রভৃতি বিষয়ে
চুনিয়া ভীষণ অজ্ঞ;
চুনিয়া তো সর্বদাই মানুষের আবিষ্কৃত
মারণাস্ত্রগুলো
ভূমধ্যসাগরে ফেলে দিতে বলে।
চুনিয়া তো চায় মানুষেরা তিনভাগ জলে
রক্তমাখা হাত ধুয়ে তার দীক্ষা নিক।
চুনিয়া সর্বদা বলে পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রগুলি
সুগন্ধি ফুলের চাষে ভরে তোলা হোক।

চুনিয়ারও অভিমান আছে,
শিশু ও নারীর প্রতি চুনিয়ার পক্ষপাত আছে;
শিশুহত্যা, নারীহত্যা দেখে দেখে সে-ও
মানবিক সভ্যতার প্রতি খুব বিরূপ হয়েছে।

চুনিয়া নৈরাশ্যবাদী নয়, চুনিয়া তো মনেপ্রাণে
নিশিদিন আশার পিদিম জ্বেলে রাখে
চুনিয়া বিশ্বাস করে;
শেষাবধি মানুষেরা হিংসা–দ্বেষ ভুলে
পরস্পর সৎপ্রতিবেশী হবে। (সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা : অন্তর্হিত – মিলিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া। **মারণাস্ত্রময় ... দাঁড়াবে** – স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই মনে প্রাণে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ও সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। চুনিয়া গ্রামটিও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা। তারা মুক্তিযুদ্ধে যেমন অসীম সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি কবি মনে করছেন পৃথিবীর যেকোনো মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধেই তারা রুখে দাঁড়াবে। **প্রকৃত বৌদ্ধ-স্বভাবের** – মহামানব গৌতমবুদ্ধ মূলত অহিংস নীতিবাদী ছিলেন। এখানে যে সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে তারাও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, এরা গৌতম বুদ্ধের মতোই শান্তিপ্রিয় ও অহিংস মনোভাবের মানুষ– এ বোধটিকে বোঝানো হয়েছে। **যোজনব্যাপী** – যোজন শব্দের অর্থ 'অনেক' বা বহু। এখানে শব্দটি স্থানবাচনার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যোজনব্যাপী হলো অনেকটা স্থানব্যাপী। **আঁতকে** – চমকে, হঠাৎ ভয় পেয়ে। **সাহচর্য** – একসঙ্গে মিলেমিশে। **দীক্ষা** – তত্ত্বজ্ঞান লাভ, এক ধরনের শপথ নেয়া। **কুরুক্ষেত্র** – প্রাচীন ভারতের একটি ঐতিহাসিক স্থান কুরুক্ষেত্র। যেখানে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কাহিনীটি মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে; **নৈরাশ্যবাদী** – নিরাশ ব্যক্তি, হতাশ ব্যক্তি, **পিদিম** – প্রদীপ, বাতি। আর্কেডিয়া – গ্রিসের একটি জায়গা, যা বহুকাল আগে থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্তি প্রিয়তার জন্য বিখ্যাত।

পাঠ - পরিচিতি : 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতাটি কবি রফিক আজাদের 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি একটি প্রতীকী গদ্য কবিতা। 'চুনিয়া' নামের একটি গ্রামের প্রতীকের মধ্য দিয়ে কবি মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচার আহ্বান জানাচ্ছেন। কবির কথায়, চুনিয়া একটি

ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম। শহর থেকে অনেক দূরে এর অবস্থান। মনোরম সবুজ প্রকৃতির পটভূমিতে স্থাপিত বলে চুনিয়া কখনো হিংস্রতা দেখেনি। রক্তপাত দেখেনি। চুনিয়া শুধু জানে মানুষকে ভালোবাসতে। মানবসমাজে আজ যে হিংসা হানাহানি রক্তপাত দেখা যায়, চুনিয়াতে এসব নেই। সবাই এখানে তাই সুখে থাকে। কবি মনে করেন, প্রতিটি মানুষই আসলে এরকম। সভ্যসমাজের অনেকেই এই ধরনের স্নিগ্ধ সুন্দর গ্রামকে অথবা গ্রামের মতো পরিবেশকে বুকের মধ্যে লালন করে থাকেন। চুনিয়া বিশ্বাস করে, মানুষ মারণাস্ত্র ফেলে, হিংসা-দ্বেষ ভুলে পরস্পর সৎ প্রতিবেশী হবে। কেননা মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোই হচ্ছে মানবসভ্যতার মূল কথা।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। চুনিয়া গ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চুনিয়া কী খুব অপছন্দ করে?

ক. ফুল   খ. গুলি
গ. সৎভাব   ঘ. মারণাস্ত্র

২। চুনিয়া নৈরাশ্যবাদী নয় কেন?

i. আশাবাদী বলে
ii. সভ্যতার প্রতি বিরূপ বলে
iii. পরিবর্তন প্রত্যাশী বলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মধুপুরী পল্লিটি অত্যন্ত মনোরমরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে সেখানে অমানবিক যান্ত্রিক কোলাহল পৌঁছাতে পারেনি। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে পশু, পাখি ও প্রাণী বসবাস করে। মাঝে মধ্যে সেখানে শুটিং হলেও জায়গাটির সৌন্দর্য ও মহিমা হারিয়ে যায়নি।

৩। উদ্দীপকটি 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতার কোন দিককে প্রকাশ করছে?

ক. স্পর্শকাতরতা খ. সহজ-সরলতা

গ. প্রতিযোগিতা ঘ. পরিবর্তনশীলতা

৪। উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি

খ. চুনিয়া এখনো আছে এই সভ্য সমাজের কারো কারো মনে

গ. এই নাম উচ্চারণ মাত্র যেন ভেঙে যাবে, অন্তর্হিত হবে তার প্রকৃত মহিমা চুনিয়া একটি গ্রাম

ঘ. শেষাবধি মানুষেরা হিংসা–দ্বেষ ভুলে, পরস্পর সৎপ্রতিবেশী হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জানি নে তোর ধনরতন
আছে কিনা রানির মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।

ক. 'অন্তর্হিত' শব্দের অর্থ কী?

খ. চুনিয়া এখনো কেন সভ্য সমাজের কারো কারো মনে আছে? বুঝিয়ে লিখ।

গ. "উদ্দীপকটি 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতার কোন দিককে প্রতিফলিত করেছে"– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি"– মূল্যায়ন কর।

মিছিল

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

[**কবি-পরিচিতি :** রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ১৬ই অক্টোবর ১৯৫৬ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাগেরহাটের মোংলায়। তিনি ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মূলত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদী কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। এছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণআন্দোলন ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের অসাধারণ এক কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য: *উপদ্রুত উপকূল*, *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম*, *মানুষের মানচিত্র* ইত্যাদি। ২১শে জুন ১৯৯১ সালে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর অকালপ্রয়াণ ঘটে।]

যে যাবে না সে থাকুক, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।
যে-সত্য জেনেছি পুড়ে, রক্ত দিয়ে যে-মন্ত্র শিখেছি,
আজ সেই মন্ত্রের সপক্ষে নেবো দীপ্র হাতিয়ার।
শ্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

প্রথমে পোড়াই চলো অন্তর্গত ভীরুতার পাপ,
বাড়তি মেদের মতো বিশ্বাসের দ্বিধা ও জড়তা।
সহস্র বর্ষের গ্লানি, পরাধীন স্নায়ুতন্ত্রীগুলো,
যুক্তির আঘাতে চলো মুক্ত করি চেতনার জট।

আমরা এগিয়ে যাবো শ্রেণিহীন পৃথিবীর দিকে,
আমাদের সাথে যাবে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস,
অনার্যের উষ্ণ লহু, সংঘশক্তি, শিল্পে সুনিপুণ
কর্মঠ, উদ্যমশীল, বীর্যবান শ্যামল শরীর।

আমাদের সাথে যাবে ক্ষেত্রভূমি, খিলক্ষেত্র, নদী,
কৃষি সভ্যতার স্মৃতি, সুপ্রাচীন মহান গৌরব।
কার্পাশের দুকূল, পত্রোর্ন আর মিহি মসলিন,
আমাদের সাথে যাবে তন্তু-দক্ষ শিল্পীর আঙুল।

চলো, আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের সাথে যাবে
বায়ান্নর শহিদ মিনার, যাবে গণ-অভ্যুত্থান,
একাত্তর অস্ত্র হাতে সুনিপুণ গেরিলার মতো।
আমাদের সাথে যাবে ত্রিশ লক্ষ রক্তাক্ত হৃদয়।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা: পরাধীন- অন্যের অধীন। **শ্রেণিহীন পৃথিবী-** এমন এক পৃথিবী যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ থাকবে না। **কর্মঠ-** কাজে পারদর্শী, পরিশ্রমী। **উদ্যমশীল-** আগ্রহ রয়েছে এমন। **কৃষিসভ্যতার স্মৃতি-** আমাদের এই বাংলা অঞ্চল কৃষি ক্ষেত্রে খুব উন্নত ছিল । সেই উন্নত কৃষি সভ্যতার স্মৃতিকে মাথায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি: 'মিছিল' কবিতাটি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর ছোবল কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবি অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মিছিলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন দেশকে এগিয়ে নেওয়ার মন্ত্রে পথ চলায় আমাদের ভয়হীন ও দৃঢ় হতে হবে। একটি শ্রেণিহীন সমাজ বিনির্মাণের সংগ্রাম ও মিছিলে এ দেশের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। আমাদের রয়েছে গৌরবজনক কৃষিসভ্যতা, মসলিন কাপড়, কারুশিল্পের ঐতিহ্য। রয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তাক্ত স্মৃতি। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার মিছিলে এসব আমাদের প্রেরণার উৎস।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যুক্তির আঘাতে কবি কোনটি মুক্ত করতে চান?

ক. বিশ্বাসের দ্বিধা খ. ভীরুতার পাপ

গ. চেতনার জট ঘ. পরাধীন

২. কবিতাটিতে বায়ান্নর শহিদ মিনার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে কেন?

ক. ভাষা শহিদদের স্মরণ করতে খ. নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে

গ. মিছিলে অংশগ্রহণ করতে ঘ. নতুন শহিদ মিনার গড়তে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাঙালি জাতির ইতিহাস দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু আজও যখন পদে পদে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আমাদের চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করে তখন প্রয়োজন ঐক্যের। আবীর, অর্ণব, আলী, ডোনাস যে যে ধর্মের হোক না কেন, তাদের অঙ্গীকার সুন্দর সুখী শোষণমুক্ত একটি পৃথিবী গড়া।

৩. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি?

ক. শ্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো আমরা এগিয়ে যাই খ. যুক্তির আঘাতে মুক্ত করি চেতনার জট

গ. আমাদের সাথে যাবে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস ঘ. আমরা সশস্ত্র হই সমতার পবিত্র বিশ্বাসে

৪. উদ্দীপকের আবীর অর্ণবের মধ্যে কবির যে চেতনা পরিস্ফুট তা হলো–

i. গণমানুষের প্রতি মমতা

ii. দেশাত্মবোধ

iii. ঐতিহ্য চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলাদেশ নামক ছোট্ট দেশটি যখন সবে ১৩ বছরে পা দিল, সেলিম সাহেব তখন তেত্রিশে। ভাষা আন্দোলন তার কাছে আবছা আবছা, গণঅভ্যুত্থান তার চোখে জ্বলজ্বল করছে আজও, আর মুক্তিযুদ্ধ? সে তো ছবির মতো স্পষ্ট। কিন্তু চারিদিকের অস্থিরতা তাকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি ভাবেন- কী চেয়েছিলাম আর কী পেলাম। অনুভব করেন দেশের এই অস্থিরতা, চারিদিকে অন্যায়, অত্যাচার-অনাচার দূর করতে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ শক্তির।

ক. মিছিল কবিতায় কবি প্রথমে কোনটিকে পোড়ানোর কথা বলেছেন?

খ. 'পরাধীন স্নায়ুতন্ত্রীগুলো' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. সেলিম সাহেবের চেতনায় 'মিছিল' কবিতার যে বিশেষ দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'মিছিল' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি" – কথাটি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : বাংলা সাহিত্য

বিদ্যা সজ্জনকে করে বিনয়ী,
দুর্জনকে করে অহংকারী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।